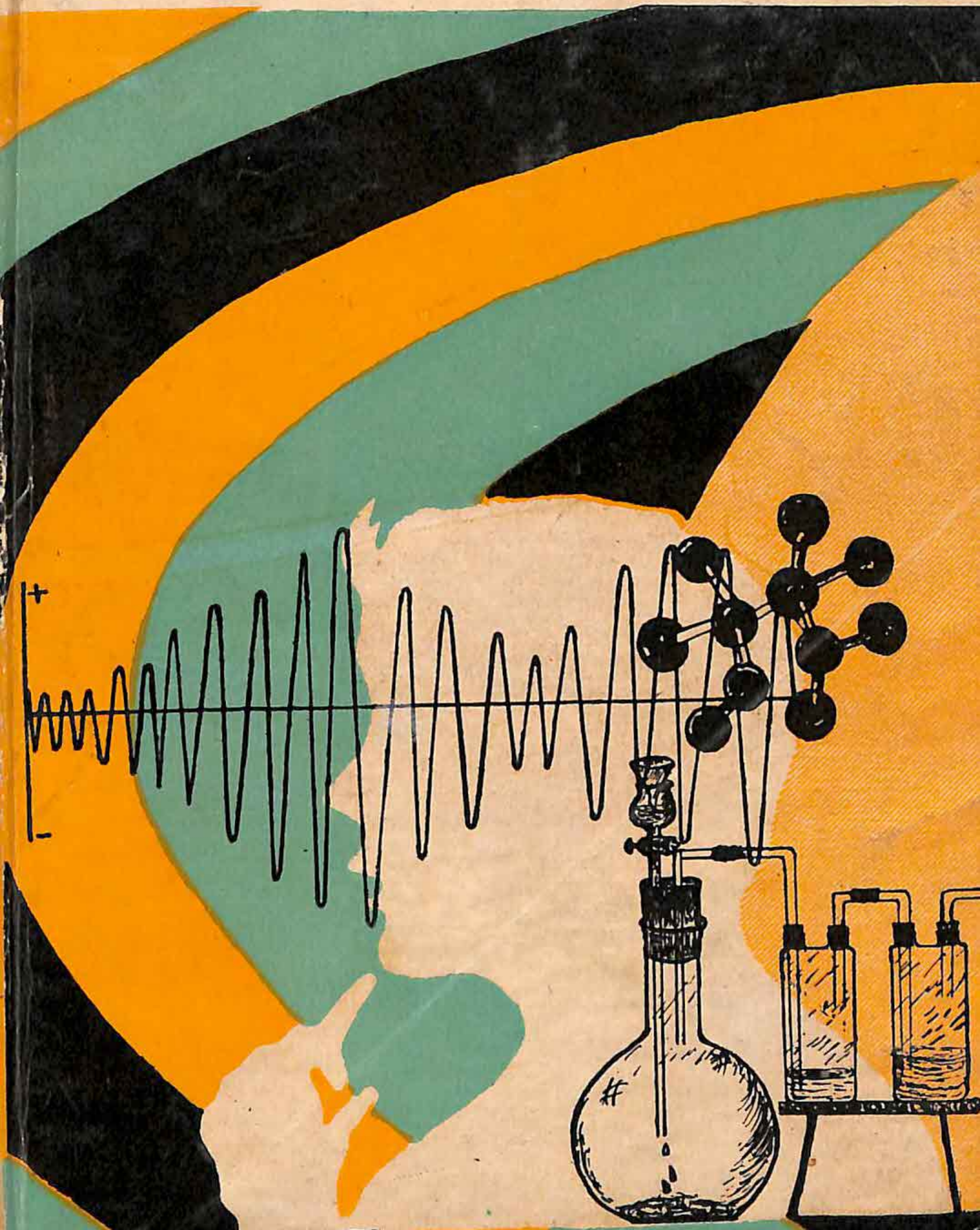
বিজ্ঞানের বিস্ময় / সুমথনাথ ঘোষ



বিজ্ঞানের বিস্ময়

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

পুর্ণমূদ্রণ শ্রাবণ—১৩৮৭

৬২. চার টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী—বব্ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ বাগচী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের বিস্ময়

বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে। বলাবাহুল্য এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিজ্ঞানের জগতে কত কল্পনাতীত অগ্রগতি হয়েছে, তাই কোন্ ক্ষেত্রে কতটা হয়েছে তা যাতে ছেলেমেয়েরা সহজেই জানতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে বইটির কোথাও কোন পরিবর্তন না করে যথাযথ পুনর্মুদ্রিত হলো।

লেখক

বিজ্ঞানের বিস্ময়

টেলিভিসন

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের শেষ নেই।

নিত্য নতুন জিনিষ তাঁরা কোথা থেকে এনে যে আমাদের চোখের সামনে ছেড়ে দেন তা আমরা ভেবে পাই না। যা অবিশ্বাস্য, যা কল্পনাতীত ছিল একদিন তাকে হাতের কাছে পেয়ে, আমরা বিস্মিত হই।

অথচ বৈজ্ঞানিকরা বলেন, আশ্চর্য হবার এতে কি আছে? সমস্তই ত রয়েছে বিশ্বচরাচরে—আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে, দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়ে। পৃথিবীর ওপরে যা কিছু বস্তু রয়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তা আমাদের কাছে প্রকৃতির বিস্ময় বা ভগবানের অপূর্ব দান বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সত্য নয়। মানুষের জ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ যখন এসব ব্যাপার নিয়ে মানুষ ভাবতে শেখেনি—শুধু কোনরকমে দুটো খেয়ে আর ঘুমিয়ে দিন কাটাতো তখন যা কিছু তারা বুঝতে পারতো না তাকেই মনে করতো বুঝি ভগবানের দান বলে। এককথায় তাদের জ্ঞানের বাইরে যা কিছু ছিল, সব অলৌকিক মনে করে তারা বিস্ময়বোধ করতো।

কিন্তু আজকের মানুষের সঙ্গে সেসব দিনের মানুষের তফাৎ অনেক। আজকের মানুষ বুঝতে শিখেছে, শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পশুপক্ষীরা যেমন করে বাঁচে মানুষও তেমনি

ভাবে বাঁচতে পারে না। মানুষ পশুপক্ষীর চেয়ে অনেক বড়—তাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে অফুরন্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির অপরিমিত দান; কিন্তু পশুপক্ষী বা অন্য কোন জীবজন্তুর মধ্যে তা নেই বললেই হয়; সেইজন্য মানুষ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব; আর মানুষ ছাড়া অন্য সব জীবকে ইতর প্রাণী বলা হয়।

এই সব ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষ সকল বিষয়ে পৃথক—আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে কোথাও তাদের সঙ্গে এদের মিল নেই; সেই সৃষ্টির প্রথম যুগেও ইতর প্রাণীরা যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে।

মানুষ এই কথাটি যেদিন থেকে জানতে পারলে সেইদিন থেকেই সে জাগল। তার চোখ খুলে গেল। একটু একটু ক'রে সমস্ত জিনিষ মানুষ দেখতে শিখলে।

আর যত দেখে ততই তার জ্ঞান বাড়ে।

এইভাবে সে যখন জানতে ও চিনতে শিখলে তখন ভাবতে লাগল কেন এমন হয়?

এই কেন থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে কোন জিনিষকে জানা।

তাই যিনি যত ভালভাবে জানতে পারেন, তিনিই তত বড় বৈজ্ঞানিক।

বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস কোন জিনিষই আপনা-আপনি হয় না—প্রত্যেক কার্যেরই একটা কারণ আছে। এই কার্য-কারণ সম্পর্ক তাঁরা অনুসন্ধান করেন এই পৃথিবীতে যা রয়েছে তারি মধ্যে। এইভাবে যে কোন একটা সূত্র অবলম্বন করে তাঁরা অগ্রসর হন আবিষ্কারের পথে। তাই বৈজ্ঞানিকরা বলেন সমস্তই রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে শুধু দেখতে

জানলেই হয়।

বাস্তবিক কথাটা সত্য।

প্রথমটা একটা জিনিষ দেখে আমরা যত বিস্মিত হই, পরে আর তার বিস্ময় ততটা থাকে না, মনে হয় এইরকমই ত হওয়া উচিত।

সেইজন্য ঘরে বসে যখন সুইচ টিপলেই হাজার হাজার প্রদীপের আলো জ্বলে ওঠে, বেতারে বিলেত কিংবা আমেরিকার লোকদের কথা শুনি, হ্যালো বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত কোন লোকের সঙ্গে কথা বলি তখন আর মনে বিস্ময় জাগে না। প্রত্যহের ব্যবহারে নতুনত্বের রোমাঞ্চকর অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়।

অথচ ভেবে দেখ দেখি আজ তোমরা যে সাড়ে চার আনা পয়সা খরচ করে বায়স্কোপ দেখে আসো তার মূলে রয়েছে কত বৈজ্ঞানিকের কি জীবনব্যাপী তপস্যা!

কতকগুলো নরনারী যারা বিলেত আমেরিকার মত সুদূর অঞ্চলে রয়েছে তাদের স্থবির ও জড় ছবিগুলি বাক্সয় পুরে আমাদের এখানে আসে; তারপর বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে— হাত পা নাড়ে, কথা কয়, গান গায় আমাদেরই চোখের সামনে।

আবার বৈজ্ঞানিকরা এমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার মধ্যে দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আকাশের গায়ে যে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র গ্রহ ও উপগ্রহ রয়েছে তাও স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়।

এইভাবে প্রতিদিন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা একদিকে যেমন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি মানুষের দৈনন্দিন কার্যে এত সুখস্বাচ্ছন্দ্য দান করছেন যে আজ সমস্ত পৃথিবী তাঁদের অধীন হয়ে পড়েছে। সংসারের খুঁটিনাটি কাজটি পর্যন্ত আজ এই বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করছে। খাওয়া থেকে সুরু করে শোওয়া পর্যন্ত

এই বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের একপা চলবার উপায় নেই। তাই বর্তমান যুগকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলা হয়।

কিন্তু এত আবিষ্কার করেও বৈজ্ঞানিকদের চোখে ঘুম নেই। আরো আবিষ্কার করার জন্য তাঁরা দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করছেন। যত পায় তত যেন তাঁদের পাবার নেশা বাড়ে, একটা থেকে আর একটা, আবার আর একটা থেকে আরো একটায়, তাঁরা চলে যান।

এমনি করে বেড়ে চলেছে বৈজ্ঞানিকদের নিত্য নূতন আবিষ্কার। কবে যে এর শেষ হবে কেউ জানে না।

তবুও যা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বর্তমানে মাথা ঘামাচ্ছেন তাকে শেষ বললে ভুল করা হবে। এইরকম অতি আধুনিক কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বলবো।

আগেই বলেছি বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বলে দূরত্বকে হাতের মধ্যে পেয়েছেন অর্থাৎ চোখের সামনে এনেছেন; দূরের জড় ছবিকে ধরে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এমন করে দিয়েছেন যে তাদের পৃথিবীর যে কোন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়; আবার বেতারে মানুষের কণ্ঠস্বর দূরদূরান্ত প্রদেশ থেকেও শোনা যায়। অবশ্য এর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার আলাদা আলাদা যন্ত্র এবং আলাদা আলাদা নাম আছে। আবার তাদের আবিষ্কারকও স্বতন্ত্র।

এখন এই সব জিনিষগুলিকে মিলিয়ে এক ক'রে একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করবার কল্পনা বৈজ্ঞানিকদের মাথায় গেল। অর্থাৎ চোখে দেখাও যাবে, কথা শোনাও যাবে, আবার সুদূর অঞ্চলে পাঠানেও যাবে এমন একটা যন্ত্র।

এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা 'টেলিভিসন্।'

তার মানে পৃথিবীর যে কোন স্থানের লোককে যে কোন স্থান থেকে দেখা যাবে এবং তার কথা শোনা যাবে। মনে করো অষ্ট্রেলিয়ায়

ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, কি জার্মানীতে যুদ্ধ হচ্ছে, আর তোমরা ঘর থেকে বসে বসে তাই দেখছো। এখন তোমরা সুইচ টিপলেই রেডিয়োতে গান শুনতে পাও, যুদ্ধের খবরও শুনতে পাও কিন্তু মানুষকে দেখতে পাও না। এই টেলিভিসন যন্ত্রে কিন্তু দুইই পাবে। মানুষকে যেমন দেখবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার কথাও শুনতে পাবে। মোটকথা সেখানে যা কিছু সত্যিকার ঘটছে সবই হুবহু এই টেলিভিসন যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তোমরা শুনবেও চোখে দেখবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে আসল ব্যাপার হ'লো এই, যে-জিনিষটি যেখানে যেমন ঘটছে তাকে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রেরণ করা দূর দুরান্তরে।

বৈজ্ঞানিক জগতে টেলিভিসন একটা বিরাট ও বিস্ময়কর আবিষ্কার হলেও তার বয়স কিন্তু বেশী নয়। বোধ হয় আজ পর্যন্ত যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে টেলিভিসন তাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে সবশেষে।

কিন্তু অল্প দিন হ'লেও খুব শীগ্‌গির তোমরা এর মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে সমস্ত জগতকে। আর সিনেমাতে গিয়ে সংবাদ চিত্র দেখে কিংবা রেডিওতে খবর শুনে কল্পনার সাহায্যে ব্যাপারটা অনুমান করতে হবে না। এখন থেকে যেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত দর্শকদের মত তোমরাও সমান উত্তেজনা, সমান আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। বিলেতে খেলা হচ্ছে আর এখানে টেলিভিসনের মধ্যে তাই দেখতে দেখতে তোমাদের মনে হবে যেন মাঠেই বসে আছো, আর চোখের সামনে সেই খেলা হচ্ছে।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বৈজ্ঞানিকরা এই টেলিভিসনের মূল সূত্রগুলির কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তবুও যে আজ তার শৈশব অবস্থা কাটল না এর

জন্য দোষ বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া যায় না। কেননা যদিও তাঁরা জানতেন যে একদিন এই টেলিভিসন জগতে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে, আর তার দ্বারা অসাধ্য সাধন হবে তবুও এই জিনিষটির আবিষ্কার এতদিন সম্ভব হয়নি শুধু উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে।

আজ পর্যন্ত যত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে তার কোনটাই পরীক্ষার সময় টেলিভিসনের মত এত বেশী বেগ দেয়নি। তাই বৈজ্ঞানিকদের হিমসিম খেতে হয়েছিল এর গবেষণা চালাতে এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরী করতে।

এখন কেমন করে এই টেলিভিসন যন্ত্র কাজ করে তা বলার পূর্বে তোমাদের জানা দরকার রেডিয়োতে যে গান বা বক্তৃতা শুনতে পাও তা কেমন করে আসে দূরদূরান্তর থেকে।

এর অনেক কলকব্জা ও বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটী আছে সত্য; তবে মোটামুটি বলতে গেলে এই বলা যায় যে বাতাসে যে-শব্দতরঙ্গ ওঠে তাই 'মাইক্রোফোন' যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিণত হয়ে 'ইথারের' সাহায্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

গায়ক বা বক্তাকে প্রথমে মাইক্রোফোন যন্ত্রের সামনে বসে গান গাইতে বা বক্তৃতা করতে হয়। আর মাইক্রোফোন সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের তরঙ্গকে বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত করে; তারপর সেই অদৃশ্য বিদ্যুতপ্রবাহ ইথারে ভর করে পৃথিবীর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এইভাবে সুদূর আমেরিকা ও বিলেত থেকে গান ও বক্তৃতা বেতারে আমাদের ঘরে এসে পৌঁছয়।

এই ইথার বস্তুটী কিন্তু বড় অদ্ভুত—জগতের সর্বত্র আছে অথচ চোখে দেখা যায় না। মানে আজ পর্যন্ত তাকে প্রত্যক্ষ করবার মত কোন যন্ত্রই আবিষ্কার হয়নি। এদিকে বৈজ্ঞানিকরা অদৃশ্য এই ইথারের দ্বারা নানারকমের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই তাকে দেখতে না পেলেও

তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

বেতারে যেমন শুধু শব্দ প্রেরিত হয় টেলিভিসনে সেইরূপ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছবিও প্রেরণ করা হয়।

বৈজ্ঞানিকরা তাই সর্বপ্রথম চিন্তা করতে লাগলেন যেভাবে শব্দ তরঙ্গ বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত হয়, সেইভাবে ছবি বা দৃশ্যপটকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করা যায় কিনা? মাইক্রোফোনের মত অন্য কোন যন্ত্র আবিষ্কার করলে টেলিভিসন'এর এই উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা?

গবেষণার পর গবেষণা চলতে লাগল। যন্ত্রের পর যন্ত্র তৈরী করে এর পরীক্ষা শুরু হলো।

এইভাবে একদিন হঠাৎ বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করে ফেললেন একটি অদ্ভুত যন্ত্র। তার নাম 'ফোটো ইলেক্‌টিক সেল্‌'।

ব্যস্‌, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এরসঙ্গে বৈজ্ঞানিকরা আর একটি অত্যাশ্চর্য জিনিষও আবিষ্কার করলেন তার নাম 'ইলেকট্রন'। এটা আর কিছুই নয় সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তড়িৎ অণু—এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না অথচ নাকি এত শক্তিশালী যে এ পারে না এমন কাজ নেই পৃথিবীতে। বৈজ্ঞানিক জগতে এ একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার! বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এই ইলেকট্রন্‌ পৃথিবীতে একদিন যুগান্তর আনবে। থাক সেকথা এখন—পরে তোমাদের এর সম্বন্ধে সবিস্তারে বলবো।

এখন এই যে প্রবল শক্তিসম্পন্ন তড়িৎঅণু বা ইলেকট্রন্‌ এরা যখন একদিকে দ্রুত চলতে থাকে তখনই বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, অন্তত বৈজ্ঞানিকদের তাই ধারণা। আবার সোডিয়াম বা পটাসিয়াম নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ওপর আলোক তরঙ্গ প্রতিফলিত হলেও নাকি এই ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণার স্রোতের সৃষ্টি হয়—এরই অপর

নাম হ'লো বিদ্যুৎপ্রবাহ।

এখন এই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামের ওপর যে আলোক তরঙ্গ এসে পড়ে, তার প্রকৃতি ও শক্তির ওপর নির্ভর করে নাকি সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকৃতি ও শক্তি।

সেইজন্য প্রথমে এই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামকে 'ফটো ইলেকটিক সেল'এর মধ্যে রেখে, যে ছবিকে পাঠাতে হবে বেতারে, তার ওপরে অত্যন্ত তীব্র আলোকরশ্মিপাত করতে হয়। এখানে সব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এমন জায়গায় সেই ছবিটিকে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে এই আলোক তরঙ্গ ক্ষিপ্রগতিতে ছবি থেকে এসে সেই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামের ওপর পড়ে। ব্যস্—তাহ'লেই কাজ হয়ে গেল।

আগে বলেছি আলোক-তরঙ্গ এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের ওপর পড়লেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এখন যেরকমের ছবি বা যেরকমের জিনিষ থেকে এই আলো প্রতিফলিত হবে সেই রকমের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইথারে সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে।

তাহ'লে এখন বুঝতে পারছো রেডিও ব্রডকাষ্টিং'এ মাইক্রোফোন যে কাজ করে, টেলিভিসনে 'ফটো ইলেকট্রিক সেল' ও ঠিক সেই কাজ করে।

ব্রডকাষ্টিং'এর রিসিভার যেমন বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে, আর তার ফলে আমরা দূরের কথা শুনতে পাই সে-রকম রিসিভার এখানেও আছে।

এই রিসিভারই আবার ইথার থেকে তড়িৎ-অণুর সাহায্যে ছবি ধরে এনে আলোক তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ফলে ছবি এবং তার সঙ্গে শব্দ একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

তবে যেখান থেকে ছবি পাঠানো হবে সেখানকার wave length

বা-আলোক তরঙ্গের সঙ্গে এখানকার যন্ত্রটি মিলিয়ে নিতে হবে। তাহ'লেই ছবি দেখা যাবে। এই হ'লো টেলিভিসনের মোটামুটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বা গোড়ার কথা। তখন থেকে নিত্য নতুন আরো যান্ত্রিক উন্নতির ফলে বর্তমানে রঙীন ছবি একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা টেলিভিসনে দেখতে পাচ্ছি।

এই যন্ত্রটি যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন তাঁর নাম 'জন লগি বেয়ার্ড। ইনি স্কটল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

১৯২৫ সালে টেলিভিসনের টুকরো অনেক প্রদর্শনী হয়েছিল কিন্তু ১৯২৭ সালে আমেরিকাতে এর সম্পূর্ণ প্রদর্শনী দেখানো হয়। সেখানে এর প্রতিটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ যন্ত্রটির সমস্ত প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ক'রে জনসাধারণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। দূরত্ব তখন খুব বেশী ছিল না—ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক সহর পর্যন্ত।

কিন্তু তার এক বছর পরে মিঃ বেয়ার্ড অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে পাঠালেন ছবি। আর এবারে শুধু ছবিই গেল না। তার সঙ্গে দেখা গেল রঙ—যে জিনিষটি যেমন দেখতে একেবারে হুবহু তেমান।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো। দারুণ উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখাদিল চারিদিকে। আমেরিকা ও ইউরোপ তখন উঠে-পড়ে লাগল সেই জিনিষটি আয়ত্ত করবার জন্য।

বৃটেন হ'লো সবচেয়ে অগ্রণী।

১৯৩২ সালের মধ্যে সেখানে টেলিভিসনের জন্য রীতিমত একটা ব্যবস্থা হ'লো। এবং বি, বি, সি নাম দিয়ে একটা ষ্টুডিও তৈরী করে সেখানে নিয়মিত টেলিভিসনের গবেষণা শুরু হলো। কিন্তু এত অল্প-দিনের মধ্যে তারা কাজটা ঠিক সুষ্ঠুভাবে ক'রে উঠতে পারলে না।

নাম হ'লো বিদ্যুৎপ্রবাহ।

এখন এই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামের ওপর যে আলোক তরঙ্গ এসে পড়ে, তার প্রকৃতি ও শক্তির ওপর নির্ভর করে নাকি সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকৃতি ও শক্তি।

সেইজন্য প্রথমে এই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামকে 'ফটো ইলেকটিক সেল'এর মধ্যে রেখে, যে ছবিকে পাঠাতে হবে বেতারে, তার ওপরে অত্যন্ত তীব্র আলোকরশ্মিপাত করতে হয়। এখানে সব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এমন জায়গায় সেই ছবিটিকে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে এই আলোক তরঙ্গ ক্ষিপ্রগতিতে ছবি থেকে এসে সেই পটাসিয়াম বা সোডিয়ামের ওপর পড়ে। ব্যস্—তাহ'লেই কাজ হয়ে গেল।

আগে বলেছি আলোক-তরঙ্গ এই তুটি রাসায়নিক পদার্থের ওপর পড়লেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এখন যেরকমের ছবি বা যেরকমের জিনিষ থেকে এই আলো প্রতিফলিত হবে সেই রকমের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইথারে সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে।

তাহ'লে এখন বুঝতে পারছো রেডিও ব্রডকাষ্টিং'এ মাইক্রোফোন যে কাজ করে, টেলিভিসনে 'ফটো ইলেকট্রিক সেল' ও ঠিক সেই কাজ করে।

ব্রডকাষ্টিং'এর রিসিভার যেমন বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে, আর তার ফলে আমরা দূরের কথা শুনতে পাই সে-রকম রিসিভার এখানেও আছে।

এই রিসিভারই আবার ইথার থেকে তড়িৎ-অণুর সাহায্যে ছবি ধরে এনে আলোক তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ফলে ছবি এবং তার সঙ্গে শব্দ একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়।

তবে যেখান থেকে ছবি পাঠানো হবে সেখানকার **wave length**

বা-আলোক তরঙ্গের সঙ্গে এখানকার যন্ত্রটি মিলিয়ে নিতে হবে। তাহ'লেই ছবি দেখা যাবে। এই হ'লো টেলিভিসনের মোটামুটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বা গোড়ার কথা। তখন থেকে নিত্য নতুন আরো যান্ত্রিক উন্নতির ফলে বর্তমানে রঙীন ছবি একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা টেলিভিসনে দেখতে পাচ্ছি।

এই যন্ত্রটি যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন তাঁর নাম 'জন লগি বেয়ার্ড। ইনি স্কটল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

১৯২৫ সালে টেলিভিসনের টুকরো অনেক প্রদর্শনী হয়েছিল কিন্তু ১৯২৭ সালে আমেরিকাতে এর সম্পূর্ণ প্রদর্শনী দেখানো হয়। সেখানে এর প্রতিটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ যন্ত্রটির সমস্ত প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ক'রে জনসাধারণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। দূরত্ব তখন খুব বেশী ছিল না—ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক সহর পর্যন্ত।

কিন্তু তার এক বছর পরে মিঃ বেয়ার্ড অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে পাঠালেন ছবি। আর এবারে শুধু ছবিই গেল না। তার সঙ্গে দেখা গেল রঙ—যে জিনিষটি যেমন দেখতে একেবারে হুবহু তেমন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে সে খবর ছড়িয়ে পড়লো। দারুণ উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখাদিল চারিদিকে। আমেরিকা ও ইউরোপ তখন উঠে-পড়ে লাগল সেই জিনিষটি আয়ত্ত করবার জন্য।

বৃটেন হ'লো সবচেয়ে অগ্রণী।

১৯৩২ সালের মধ্যে সেখানে টেলিভিসনের জন্য রীতিমত একটা ব্যবস্থা হ'লো। এবং বি, বি, সি নাম দিয়ে একটা ষ্টুডিও তৈরী করে সেখানে নিয়মিত টেলিভিসনের গবেষণা শুরু হলো। কিন্তু এত অল্প-দিনের মধ্যে তারা কাজটা ঠিক সুষ্ঠুভাবে ক'রে উঠতে পারলে না।

তাই আবার ১৯৩৫ সালে এর জন্য একটা পরামর্শ কমিটি গঠিত হ'লো। তারপর ১৯৩৬ সালেই তারা এমন সব কলকব্জা ও অত্যাশ্চর্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে ফেললে যে তখনই সেই প্রতিষ্ঠানটি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার বলে খ্যাতি লাভ করলে।

এই বৃটিশ টেলিভিসন যন্ত্রাগারটির বা স্টুডিয়োর ঠিকানা হ'লো 'আলেকজেন্ড্রা প্যালেস—লণ্ডন।

বহুদূর থেকে এই বাড়িটি দেখা যায়। আশিফুট উঁচু একটা মিনারের ওপর থেকে জাফরীর আকারে ২২০ ফুট একটা ধ্বজা ওঠে গেছে তাতে 'এরিয়াল' তার জড়ানো আছে। সমূদ্র সমতল থেকে তার উচ্চতা সবশুদ্ধ ছ'শো ফুটেরও বেশি। ছবিকে নিখুঁত ভাবে পাবার জন্যে নাকি এই রকম উচ্চতার প্রয়োজন!

এই যন্ত্রাগারে ছবি প্রেরণ করবার যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়—তা দু-জন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার—বেয়ার্ড ও মার্কনির।

মার্কনির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। ইনি হলেন সেই বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যিনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

এবার মার্কনির এই যন্ত্রটির নাম হ'লো মার্কনি ই, এম, আই। বর্তমানে এইটাই টেলিভিসনের কাজের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক।

এই যন্ত্রের সাহায্যে এখন নাকি পঁচিশ থেকে পঁইতিরিশ মাইল দূরের যে কোন ছবিকে ধরা যায়। আর অবস্থা বিশেষে আরো দূরের ছবিও এই যন্ত্রে আসে—ষাট, সত্তোর এমন কি একশো মাইল পর্যন্ত।

তখন অবশ্য ভাবা যায়নি যে এমন দিন শীগগিরই আসবে যখন আমাদের দেশেও লোক রেডিয়ো সেটের মত ঘরে ঘরে এই টেলিভিসন সেট রাখতে পারবে। এখন কি সুবিধা হয়েছে একবার ভেবে দেখ দেখি। সমস্ত পৃথিবী তোমাদের ঘরে এসে ধরা দিয়েছে।

ইলেকট্রন

এইবার তোমাদের ইলেকট্রনের কথা বলছি।

এই বস্তুটি বৈজ্ঞানিক জগতে সম্পূর্ণ নবাগত না হ'লেও এর কর্ম-শক্তির কথা বৈজ্ঞানিকরা খুব অল্পদিন হ'লো জানতে পেরেছেন। তাঁরা বলছেন যে এর মধ্যে নাকি এমন সব বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে যে ভবিষ্যতে অসম্ভব বলে আর কিছুই থাকবে না পৃথিবীতে।

একদিন হয়ত এই ইলেকট্রনের সাহায্যে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে, রাসায়নিক সোনাকে প্ল্যাটিনামে পরিণত করতে পারবে, মানুষে জামার পকেটে করে রেডিয়ো টেলিফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াবে পথে ঘাটে, রন্ধন-কার্যে মেয়েদের আর আগুনের প্রয়োজন হবে না, এমন কি পাগলেরও মাথা ভালো হয়ে যাবে এবং রোগীর দেহে আর অসুখ বলে কিছু থাকবে না। অবশ্য এই সমস্তই সম্ভব হবে যদি সত্যিসত্যি বৈজ্ঞানিকরা এই ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণ বশ করতে পারেন।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে যার ভেতরে এই রকম প্রচণ্ড শক্তি সেই তড়িৎঅণু পদার্থটি এত ছোট যে চোখে দেখাই যায় না। অণু, পরমাণু ত দূরের কথা—এগুলি তার শতাংশের একাংশের চেয়েও সহস্র-গুণ ছোট—এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়েও নাকি দেখা যায় না।

কিন্তু এত সামান্য পদার্থ হ'লেও কী অসামান্য তাদের ক্ষমতা!

এই রকম লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম কণা একত্রিত হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে তার দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এর সাহায্যে অর্গল বদ্ধ কঠিন দরজা খোলা যায়, লিফ্‌টের মত বিরাট যন্ত্রকে ওপর থেকে মাটিতে নামিয়ে আনা

যায়, চোর এলে সতর্ক ঘন্টা আপনি আপনি বেজে ওঠে, এবং ঘড়ির সময়ও নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া এর দ্বারা ধোঁয়া কোথা থেকে বেরুচ্ছে ধরা যায়, আগুন নেভানো যায়, একটা রঙের সঙ্গে আর একটা রঙ মেশানো যায় এবং অতি পাতলা কাগজ যে কত পুরু তাও মাপা যায়।

তাছাড়া তোমাদের আগেই বলেছি যে এই ইলেকট্রনের দ্বারাই আজ একমাত্র টেলিভিসনের ছবিকে দিগদিগন্তে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। এর যে কত গুণ তা মুখে ব'লে শেষ করা যায় না! বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন একদিন এর ভেতর দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগের জীবাণুকে ধরতে পারবেন, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, বাতাসের চাপ ও আবহাওয়ার আর্দ্রতার পরিমাপ স্থির করতে পারবেন এবং অতি ক্ষুদ্র জড় পদার্থের মধ্যে কতটুকু গ্যাস, কতটুকু কি তরল বস্তু থাকে তাও অনুমাণ করতে পারবেন। যদিও এইগুলির কোনটি চোখে দেখা যায় না তবুও একদিন ইলেকট্রনের দ্বারা সব কিছু অসম্ভব সম্ভব হবে, এই বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস।

তবে জিনিষটা মুখে যত সহজে বলা গেল কাজে যে তেমন নয় তা বোধহয় তোমরা বুঝতেই পারছো। পৃথিবীতে এর চেয়ে কঠিন কাজ আর কি হতে পারে?

এখন এর সমস্তটাই নির্ভর করছে বৈজ্ঞানিকদের হিসাবের ওপর—আর এই হিসাব যেমন নিভু'ল তেমনি যথাযথ হওয়া চাই। তাছাড়া এসব ব্যাপারে ক্ষিপ্রতারও একান্ত প্রয়োজন। তাই একদল মানুষ এখন থেকে এর কর্মপদ্ধতি চিন্তা করতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞানের এই নূতন শাখায় যাঁরা কাজ করছেন পদার্থবিদ্‌রা তাঁদের নতুন নামকরণ করেছেন—ইলেকট্রনিকস্।

আজ তাঁদের ল্যাব্‌রেটরীতে সে সব জিনিষের গবেষণা চলছে আগামীকাল তা হয়ত সমস্ত পৃথিবীর চেহারা বদলে দেবে। এখন

তাঁদের এই সব গবেষণার ফলাফল সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও কিন্তু তার মূল্য অনেক বেশী মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে। গবেষণাগার থেকে যেদিন বাইরে এর ফল সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে সেদিন তারা এর প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারবে।

দশ বৎসর ধরে কঠিন গবেষণার পর এই ল্যাবরেটরী থেকে একটি অত্যাশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম ইলেকট্রন-অনুবীক্ষণ যন্ত্র। বৈজ্ঞানিকরা এর ভিতর দিয়ে এমন এক নতুন জগত দেখতে পেয়েছেন আলোর মধ্যে এতদিন যা অদৃশ্য হয়েছিল। হাজার হাজার রকমের বীজাণু ও জীবাণু আজ তাঁদের চোখের সামনে ধরা দিয়েছে। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশারদদের উর্বর মস্তিষ্ক যেসব রোগের কথা কল্পনা করতে কোনদিন পারেননি বা এতদিন যা দুরারোগ্য বলে তাঁরা মনে করতেন ইলেকট্রনিকসরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাও আরোগ্য হওয়া সম্ভব। এই অদ্ভুত অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি দেখে আজ সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত।

কিন্তু এর গোড়ায় একটা ভীষণ সমস্যা দেখাদিয়েছে।

বৈজ্ঞানিকরা এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সব জিনিষ দেখতে পাবেন প্রথমে সেগুলিকে চিনবেন কি করে?

মনে করো আজ যদি কোন কারণে চন্দ্রালোক থেকে কোন মানুষ পৃথিবীতে নেমে আসে তাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখলে আমাদের কি অবস্থা হবে? হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবো, চিনতে পারব না। এরকম নতুন লোক ত পৃথিবীতে আমরা আর কখনো দেখিনি!

বৈজ্ঞানিকদেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে। যেসব বীজাণু বা জীবাণুকে তাঁরা প্রথম দেখতে পাবেন তারা কে এবং কি তাদের কাজ—কি করে চিনবেন? এই অজানা জগতের অজ্ঞাত জীবগুলির পরিচয় কে বলে দেবে?

কিন্তু একবার যদি তাঁরা চিনতে পারেন তা হ'লে কি হবে বুঝতে পারছ কি ? সমস্ত জীবাণুতত্ত্বকে ভেঙ্গে চুরে আবার নতুন করে এই ইলেকট্রনিক্সরা গড়বেন—আর তাতে করে মানবজাতির কল্যাণকর এক কল্পনাতীত জগত বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

কিন্তু এই অদৃশ্য জগতের জীবগুলিকে জানতে না পারলে ত সে সমস্ত কিছুই সম্ভব হবে না ?

বাস্তবিক কেউই তা জানে না, শুধু কাজ দেখে তবে তাদের পরিচয় ঠিক করতে হবে। ইলেকট্রন্ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের সীমা এখন এই পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

এই ইলেকট্রন্ হ'লো বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটা নতুন শাখা।

যেদিন প্রথম জড়পদার্থ থেকে এই বস্তুটি পৃথক করা সম্ভব হলো সেইদিন থেকে এই নবযুগের স্মৃচনা !

আর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জে, জে থম্সন্ এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তড়িৎ-অণুর সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক যেদিন প্রথম আবিষ্কার করলেন সেদিন হ'লো এর সত্যিকারের ভিত্তিস্থাপন !

কিন্তু এই অদৃশ্য বস্তুকণাগুলি যে সত্যি সত্যি মানুষের জীবনে প্রভূত উপকারে আসতে পারে এই তথ্যটুকু জানবার জন্যও বহু দিন ধরে বৈজ্ঞানিকদের বহু গবেষণা ও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাই আজ পর্যন্ত ইলেকট্রনকে তাঁদের ইচ্ছামত যে কোন দিকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি দরকার হলে তাঁরা বাতাস দিয়ে তাদের চোঙার নলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সরু একটা রেখায় পরিণত করতে পারেন, আবার তাদের আবরণে যে কোন জিনিষকে ঢেকে দিতেও পারেন।

কেন এই তড়িৎ-অণু বা ইলেকট্রনের সাহায্যে আলোর মধ্যে যে

বস্তুকণাগুলি অদৃশ্য হয়ে থাকে তা আবার প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে?

তার কারণ এই যে ইলেকট্রনগুলি আলোক-কণার মত কাজ করে, কেননা এদেরও wave length আছে—যে আলো দেখা যায় তার লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত। এখন যদি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আলোকের wave length-র চেয়ে ছোট কোন পদার্থ দেখার চেষ্টা করা যায় তাহলে তা যে দেখা যাবে না অতি সহজেই একথা তোমরা বুঝতে পারো। কেননা হাতীকে দিয়ে যেমন যব মাড়ানো যায় না, তেমনি বড় জিনিষের মধ্যে দিয়ে এত সূক্ষ্ম কোনজিনিষ দেখাও অসম্ভব!

ইলেকট্রনের ক্ষমতার সবচেয়ে বড় কারণ হ'লো এই। অবশ্য এর আরো একটা কারণ হচ্ছে এই যে, ইলেকট্রনগুলি যে কোন অতি ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও সহজেই ঢুকে যেতে পারে। এত সূক্ষ্ম এগুলি যে, অনু পরমাণুর মধ্যে যেটুকু ব্যবধান, তার ভিতরেও প্রবেশ করতে পারে হাজারে হাজারে।

এই হ'লো একমাত্র মূল কারণ যার জন্য অনেক অবিশ্বাস্য জিনিষও আজ সত্যে পরিণত হয়েছে শুধু এই ইলেকট্রনের সাহায্যে।

বোধহয় আজ সব চেয়ে বড় কাজ যা এই ইলেকট্রন পৃথিবীর লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছে তা, হ'লো টেলিভিসনে ছবি প্রেরণ! এর সমস্তটা সম্ভব হয়েছে শুধু ইলেকট্রনকে নতুন ভাবে কাজে লাগানোর ফলে। ইলেকট্রন কেমন করে টেলিভিসনে কাজ করে তা আগের প্রবন্ধে বলেছি, তোমরা পড়েছ।

ইলেকট্রনের ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আজ এত সঙ্কীর্ণ যে,এখন কেউ বিশ্বাস করতে পারে না যে একদিন এরই সাহায্যে অন্ধ আবার তার হারাণো দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে।

কিন্তু অবিশ্বাস করলেও কথাটার মধ্যে সত্য আছে, একেবারে বাজে নয়। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, এই ইলেকট্রনের সাহায্যে যদি

কোন ছবিকে চোখের ভিতর যেখানে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিরাউপশিরাগুলি শেষ হয়েছে সেখানে ফেলতে পারা যায়, তাহলে মানুষ, তা দেখতে পায়।

অবশ্য এর দ্বারা যদি চোখের অন্য কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে তা'হলে যে এক দিন অন্ধরা দেখতে পাবে আলোছায়ার সমস্ত ছবি, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জয় হোক এই ইলেকট্রনের!

এই ইলেকট্রন নিয়ে বেশীদিন গবেষণা করতে করতে আরো কত কি যে বৈজ্ঞানিকরা এ থেকে আবিষ্কার করতে পারবেন তা হয়ত তাঁরাও এখনো জানেন না।

সম্প্রতি এই ইলেকট্রনের সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে অতি-বেগুনী-রঙের আলো মাপবার সুবিধে হয়েছে। ইলেকট্রনিকদের এইটাই হ'লো অতি আধুনিক আবিষ্কার। ছবিতে দেখলেই যন্ত্রটি কি রকম বুঝতে পারবে।

সুড়ঙ্গপথ

আজ যদি আমাদের প্রপিতামহ কিংবা বৃদ্ধ প্রপিতামহকে কোন দৈবশক্তির বলে আবার স্বর্গ থেকে এখানে নামিয়ে আনা যায় তাহ'লে তাঁরা চিনতেই পারবেন না এই পৃথিবীকে। একদিন যে স্থানে তাঁরা সত্তোর, আশি বছর বাস করে গিয়েছিলেন আজ তাকে সম্পূর্ণ নতুন স্থান বলে ভ্রম হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ঘাট বাড়ি ঘর দোর যান বাহন প্রভৃতি সব কিছুরই এত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে যে, তাদের দেখে তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন।

মানুষ একই রকম আছে দেখতে কিন্তু তাদের সভ্যতা গেছে বেড়ে। আজকাল সভ্যতা বলতে বোঝায় বিজ্ঞানের উন্নতি—যে জাতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত বড় সেই জাতি আজ তত সভ্য। সমস্ত পৃথিবী আজ তার

করায়ত্ত বলা যেতে পারে। তাই প্রতিযোগীতা চলেছে দিনরাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। তাঁরা নিত্য নতুন আবিষ্কার দিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন জগতকে। ইলেকট্রিক, রেডিও, টেলিভিসন, এরোপ্লেন, রেল, ট্রাম, মোটর বাস ইত্যাদি নিত্যনতুনরূপে কেবল মানুষকে স্বাচ্ছন্দ দান করছে না দিন দিন তাকে সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি বলতে কি এই সভ্যতাবৃদ্ধির ফলে যানবাহন আজ এত বেড়ে গেছে যে, রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। অনেক সময় কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে তোমরা এটা বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবে।

লিভারপুর ও বার্কেনহেড সহরের মধ্যে মার্সি বলে যে নদীটি আছে সেখানে একসময় ফেরী ষ্টিমারের এত ঠেলাঠেলি লেগে গেল যে, লোকে বিব্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগল, এখন উপায় কি ? কিভাবে এসমস্যা সমাধান করা যায়। দু'টি সহরই বড়—কাজেই নদী পেরিয়ে এই ফেরী ষ্টিমারে লোকজনকে অনবরত যাতায়াত করতে হয়। এই রকম পরিস্থিতি থেকে বৈজ্ঞানিক জগতে আবার এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হ'লো—সুড়ঙ্গ পথ! এই মারসির সুড়ঙ্গপথই জগতের মধ্যে নদী গর্ভের সব চেয়ে বড় পথ।

মারসি হ'লো একটা ভীষণ বাধা! তাতে স্রোত আছে অথচ সমুদ্রের খাঁড়ীর মত দেখতে—খুব গভীর, তার সব চেয়ে সরু স্থানটিও প্রায় একমাইল দৈর্ঘ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বড় বড় জাহাজ সেখান দিয়ে যাতায়াত করে।

এই দু'টি সহরের মধ্যে কিভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করলে ঠেলা ঠেলি ও ভীড় থাকবে না অথচ সহজ ও সুন্দর গতিতে জাহাজগুলি সেখান দিয়ে যেতে পারবে এই কথা তখন সেখানকার লোকেরা চিন্তা করতে লাগল।

কি করা যায় ? পুল কিংবা সুড়ঙ্গ পথ ?

সার্ভেয়ার এলো, ইঞ্জিনীয়ার এলো। তাঁরা মাপজোপ করে স্থির করলেন সুড়ঙ্গ পথ। কেননা পুলের চেয়ে এতে অনেক খরচা কম। তাঁরা হিসাব করে দেখলেন পুল করতে এগারো কোটি পাউণ্ড খরচা কিন্তু মারসির এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করতে লাগবে মাত্র সাতকোটি পাউণ্ড। এই সাতকোটি পাউণ্ড মুদ্রাও বড় কম নয়। তবুও সবাই এই নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণে সম্মতি দিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই কার্য শুরু হলো। এইটি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদীগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথ!

এই সুড়ঙ্গ পথটির দৈর্ঘ্য হ'লো ৩৭৫১ গজ। আবার তার মুখের কাছাকাছি দুই দিক থেকে এসে আরো অনেক শাখা সুড়ঙ্গপথ মিশেছে, ফলে এর মোট দৈর্ঘ্য হয়েছে ৫০৬৪ গজ। তার মানে প্রায় তিন মাইল লম্বা।

এই সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ নদীর গর্ভে খুঁড়তে হবে। কাজটা যে খুব সহজ নয় তা বোধহয় তোমরা বুঝতে পারছ। কঠিন পাথর কেটে পথ খুঁড়ে তবে তার মধ্যে দিয়ে এই সুড়ঙ্গ নিয়ে যেতে হবে। কত রকমের বিপদ আপদ দেখা দিতে পারে—হয়ত নদীর তলা থেকে হঠাৎ একটা ঝরণা ঠেলে উঠলো নয়ত ওপর থেকে সহসা নদীর জল এসে সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কে বলতে পারে নদীর অতল গর্ভে কোথায় কি আছে? কিন্তুবৈজ্ঞানিকরা ভয় পাবার মানুষ নন। তাই কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হয়ে ইঞ্জিনীয়াররা এই খনন কার্যে এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যার মধ্যে কোথা দিয়েও এক ফোঁটা জল ঢুকতে পারল না।

এই সুড়ঙ্গ পথটি শেষ করতে গিয়ে মারসি নদীর গর্ভথেকে বারো লক্ষ টন পাথর ও মাটি সবশুদ্ধ খুঁড়ে ওপরে আনতে হয়েছিল। বিরাট

ব্যাপার। এত মাটি ও পাথর দিয়ে একটা গ্রামের সমস্ত চেহারা বদলে দেওয়া যায়।

সারা রাত্তির ধরে এই সুড়ঙ্গের কাজ চলতো। আর অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় লরী সেই মাটি ও পাথর বোঝাই করে ছুটতো সহরের রাস্তায় রাস্তায়। আজ রাত্তিরে যেগুলো উঠতো, কাল রাত্তিরে সেইগুলো সাফ করে ফেলতো।

এইভাবে মাসের পর মাস ধরে কাজ যত অগ্রসর হতে লাগল তত মারসির উভয় দিক থেকে একটু একটু করে সুড়ঙ্গপথ তৈরী বেড়ে চললো। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, দু'বছর তিন মাস ধরে মাটি ও পাথর কাটবার পর তবে এই সুড়ঙ্গের প্রথম গহ্বরটি প্রস্তুত হয়েছিল। সুড়ঙ্গ নির্মাণের পথে এ একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার!

এ ছাড়া আরো বিস্ময়কর হচ্ছে এই যে, বিপরীত দিক থেকে মজুরেরা কাজ করতে করতে এগিয়ে আসে কিন্তু গর্তের মধ্যে দিয়ে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, কেউ কারো কথা শুনতে পায় না; অথচ এত নীচে, অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে এই সুড়ঙ্গ পথের দু'টি মুখ ঠিক দু'দিক থেকে এসে সমানভাবে মিশে যায়—আধইঞ্চি কি এক ইঞ্চিরও তফাৎ হয় না। অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কৌশল। এমনি করে একদিন এই বিরাট কাজ সুসম্পন্ন হয়।

প্রথমে গহ্বরের মুখ খুব বড় হয় না। সমস্তটা তৈরী হয়ে যাবার পর আবার একটু একটু করে তার পরিধি বাড়তে থাকে। মারসির এই সুড়ঙ্গ পথটির ব্যাস হলো চুয়াল্লিশ ফুট। সবটা পুরো না হলেও এর দৈর্ঘের বেশীর ভাগ হলো এই মাপের।

প্রথমে এই ভাবে গহ্বরের পরিধি যখন ঠিক মত তৈরী হয়ে যায় তখন তার ওপর ঢালাইকরা লোহার টুকরো টুকরো অংশ বলটু দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। অধিকাংশ সময় এই অংশগুলি সুড়ঙ্গের ঠিক মাপে মাপে

বসে না। তখন সুড়ঙ্গের মধ্যে লোহার দেওয়াল ও পাথরের দেওয়ালের ভিতর যেটুকু ফাঁক থাকে তাতে পাথরের কুচির সঙ্গে পাতলা সিমেন্ট মিশিয়ে ঢালাই করে দিতে হয়। এই ভাবে সুড়ঙ্গ পথের সমস্ত দেওয়ালটা একটা অখণ্ড কঠিন পদার্থে পরিণত করা হয় যখন তার মধ্যে তারপর আর কোন কিছু ঢুকতে পারে না।

এমনি করে সেই বিরাট সুড়ঙ্গপথটি নদীগর্ভে তৈরী হয়ে যাবার পর তখন তারমধ্যে দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী হলো।

সুড়ঙ্গর ঠিক মাঝখান দিয়ে চওড়া রাস্তা সোজাসুজি চলে গেছে। এই রাস্তাটি পাথর ও সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করা এবং নীচে থেকে বারো ইঞ্চি মোটা ঢালাইকরা থামের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই থামগুলি আবার এক একটা একুশ ফিট অন্তর গাঁথা।

এইভাবে এই গোলাকার সুড়ঙ্গ পথের ওপরের অর্দ্ধাংশ বা ওপরের তালাটা হলো সত্যিকারের রাস্তা—যানবাহন চলাচলের জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর নীচের অর্দ্ধাংশটা এখনও খালি পড়ে আছে। বড় বড় থামের মধ্যে যে জায়গা আছে তাতে আর একটা রাস্তা অনায়াসে তৈরী হতে পারে কিংবা প্রয়োজন হলে বৈদ্যুতিক রেলপথও বসতে পারে।

১৯৩৪ সালের ১৮ই জুলাই মারসির এই সুড়ঙ্গপথটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন আমাদের ভূতপূর্ব সম্রাট পঞ্চম জর্জ। তিনি এই পথটির নাম দিয়েছিলেন কুইন্‌স্‌ওয়ে। বাস্তবিক এটি রাণী নামের উপযুক্ত পথই বটে।

সেদিন যে লোকেরা কাদামাটি মেখে, রাতের পর রাত জেগে পাথর কেটে ঐ সুড়ঙ্গ পথটি বানিয়েছিল আজ তারা একে দেখে চিনতেই পারে না। এর সুসম্পূর্ণ সৌকার্য দেখে তারা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

রাস্তাটি ছত্রিশফুট চওড়া আর তাকে চার ভাগে বিভক্তকরা হয়েছে সারিসারি রবারের খণ্ড পুঁতে পুঁতে। এর মধ্যে দু'টো রাস্তা দিয়ে লোক ও যানবাহন একদিকে যায় আবার অপর দু'টী দিয়ে ফিরে আসে।

মোটরগাড়ী চালাবার গতি পর্যন্ত এইসব রাস্তায় বেঁধে দেওয়া আছে. মাঝখানের রাস্তা দু'টী দিয়ে ঘণ্টায় পঁইতিরিশ মাইল বেগে গাড়ী চলে; আর পাশের রাস্তা দু'টী দিয়ে ধীরগতি যানবাহন চলাচল করে—ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের বেশী বেগে কোন গাড়ীরই এ পথে যাবার হুকুম নেই।

এই পথটি দেখতে ভারী সুন্দর! ধূসর বাদামী রঙ মাখানো এর গায়ে এবং যতদূর পথটি চলে গেছে এর দুধারে ছ' ফুট উঁচু পর্যন্ত কালো পুরু কাঁচ বসানো। ওপরে সুড়ঙ্গর থামের গায়ে বড় বড় ফ্লাড্‌লাইট সোজাসুজিভাবে ঝোলানো। তার তীব্র আলোকস্রোতে সমস্ত পথটি দিবারাত্র উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। তাজা হাওয়া পাম্প করে মাঝে মাঝে এই সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে দেওয়া হয় এবং ভিতরের বাসী হাওয়া বা ধূলা ধোঁয়া মিশ্রিত দুষিত হাওয়াকে আবার তেমনি করেই বার ক'রে নেওয়া হয়। তারজন্য বড় বড় দু'টি হাওয়া ষ্টেশন নদীর দু'পাশে আছে—একটি লিভারপুলে আর একটি বার্কেনহেডে।

এইভাবে দু'টি বড় শহরের যানবাহনের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখন দিব্যি আরামে এই সুড়ঙ্গপথের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টায় চার হাজারেরও বেশী গাড়ি যাতায়াত করে। তাতে কারো কোন অসুবিধা হয় না। পৃথিবীতে আরো অনেক বড় সুড়ঙ্গ পথ আছে কিন্তু এইটি হ'লো নদী গর্ভস্থিত সর্বশ্রেষ্ঠ সুড়ঙ্গপথ।

এই পথটি তৈরী করতে সাড়ে আট বৎসর সময় লেগেছিল। বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ করে পূর্তকার্যবিভাগে এই কুইনস্‌ওয়ে একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি।

তুষারের ঐশ্বর্য

তোমরা জানো ঠাণ্ডাদেশে শীতকালে তুষারপাত হয়। রাস্তাঘাট বাড়ির ছাদ, উঠান, গাছপালা সমস্ত ঢেকে যায় বরফে। মানুষের পক্ষে তখন এই সব স্থানে বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে কতবার কত আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছে হয়ত তোমরা খবরের কাগজে সে-সব সংবাদও পড়ে থাকবে। তাই শীত আসবার আগেই সাধারণত মানুষ ঘরদোর ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এত শীত সহ্য করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া তারা কি খেয়ে সেখানে থাকবে? গাছপালা তরিতরকারী সমস্তই তখন মরে যায় বরফের চাপে। উদ্ভিদের কোন চিহ্নই থাকে না। পশুপক্ষীরা পর্যন্ত কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কে জানে! প্রকৃতি নিরাভরণা বিধবার মত শুধু বরফের সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অথচ যে বরফ এত আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং যার আঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রকৃতি পর্যন্ত ভয়ে শিউরে ওঠে তা যে কত ক্ষুদ্র বস্তু থেকে তৈরী, শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

অনেকের বিশ্বাস, মেঘের মধ্যে যে জলকণা আছে তাই ঠাণ্ডা পেয়ে জমে যায় এবং তা থেকেই এই বরফের উৎপত্তি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কেননা আমাদের চারিদিকে শুকনো হওয়াতেও সর্বদা এই জলকণা অদৃশ্য হয়ে রয়েছে।

একফোঁটা জল কোথাও পড়ে থাকলে কিংবা কালি দিয়ে লিখে ব্লটিংপেপার ব্যবহার না করলে দেখা যায় অল্পক্ষণের মধ্যে জল কোথায় শুকিয়ে গেছে এবং কালিতেও আর আর্দ্রতা নেই। এই জলকণাগুলি অতি সূক্ষ্ম আকার ধারণ ক'রে আমাদের চোখের সামনে থেকে কখন

উবে গেল আমরা তা চোখে দেখতে পাই না। এই প্রকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলিকে বলে অনু ও পরমাণু; তার আর্দ্রতা যখন এই অবস্থায় পরিণত হয় তখন তাকে বলে বাষ্প।

আবার মেঘ থেকে যে বৃষ্টির জল পড়ে এমন কি তার ভিতরেও এই অতি সূক্ষ্ম জলকণাগুলি ভেসে বেড়ায়। আর এইগুলিই সোজা-সুজি বরফের স্ফটিকে পরিণত হয় যখন তার চারিপাশের হাওয়া অত্যন্ত শীতল থাকে কিংবা সেগুলি একত্রিত হয়ে এত ভারী হ'য়ে পড়ে যে বাষ্প আর তাকে বহন করতে পারে না। মোটামুটি বলতে গেলে এই-ভাবেই তুষারের সৃষ্টি হয়।

এই তুষারের স্ফটিকগুলি সাধারণত খুব ছোট। এক ইঞ্চির একশো ভাগের এক ভাগ। আবার কোন কোনটি আধ ইঞ্চি পরিমাণও হয়। তবে এদের অধিকাংশগুলিই দেখতে স্বচ্ছ বাজারের তৈরী বরফখণ্ডের মত। এখন নানাদিক থেকে সূর্যের আলো এসে এদের ওপর প্রতিফলিত হলে নানা রকমের আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং যখন এই রকম বহু স্ফটিক এসে একসঙ্গে স্তূপীকৃত হয় তখন তাদের সবগুলির ওপর আলো পড়ে সমস্তটা মিলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

তাছাড়া যখন এই জলীয় বাষ্পের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি তুষার স্ফটিকে পরিণত হয় তখন এগুলি এক একটা কঠিন ও ভারী বস্তু হয়ে পড়ে, তাই বাতাস আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। সেই সময় তুষার পড়তে শুরু করে। পড়তে পড়তে আবার অন্যান্য তুষার খণ্ডের সঙ্গে তাদের লাগালাগি হয়ে যায়। সেই জন্যে নানা রকমের এলো-মেলো স্তূপ তুষার পাতের সময় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়—কোথাও প্রচুর, কোথাও অল্প, কোথাও ঘন বা পাতলা।

আবার তুষারের এই স্ফটিকগুলিও এক এক সময় এক এক আকারের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর বড় ছোট হওয়া সমস্তই নির্ভর করে

আবহাওয়ার ওপর।

খুব ঠাণ্ডার সময় মেঘগুলি যখন খুব উঁচুতে বাতাসে উড়ে বেড়ায় তখন বাষ্পের এই আর্দ্রতা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না—ফলে তাড়াতাড়ি জমে যায় এবং নামবার সময় অন্যান্য বরফের গায়ে লেগে গিয়ে খুব বড় বড় বরফের-চাঁই তৈরী করে। আর ঠিক সেই জন্যেই শীতকালে বরফ পড়ে বেশী।

আবার ঠিক তার বিপরীত হয় গরমের সময়। খুব ছোট ছোট তুষারের কণা, শক্ত ও কঠিন আকার ধারণ করে এবং সহজে অন্যান্য তুষারের সংস্পর্শে আসতে পায় না; সেইজন্য ঠাণ্ডার দেশে গরমের সময় অনেকখানি নিরাপদ—মানে বরফ পড়ার হাঙ্গামা খুব বেশী থাকে না। এর কারণ আর কিছুই নয়—গরমের সময় ভিজে মেঘগুলো মাটির খুব কাছে থাকে, কাজেই বরফের চাঁইগুলোও স্বতন্ত্রই থাকে—অন্য বরফের চাঁইয়ের সংস্পর্শে এসে খুব বৃহদাকার ধারণ করতে পারে না। কেননা সেই সময় জলকণা বাষ্পরূপেই বেশী থাকে, আর তাদের দেহে যা নিজস্ব উত্তাপ আছে, বরফের কণাতে তাই লাগে বলে সেগুলিও আর বড় হবার সুযোগ পায় না—অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় মাটিতে এসে পড়ে।

এই জন্যে শীতকালে যে বরফগুলি পড়ে সেগুলিকে নরম ও তরল অবস্থায় দেখা যায়। কারণ বহু দূর থেকে নামতে নামতে তারা পথেই গলে যায় অনেকটা এবং গরম কালের গুঁড়ো বরফের চেয়েও সে-গুলোকে আরো কম ঠাণ্ডা বলে মনে হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা জলের নাম দিয়েছেন H_2-0. অর্থাৎ প্রতি জলবিন্দু তিন ভাগ বাষ্পের সমষ্টি থেকে উৎপন্ন—দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন। সেই জন্যে কেউই সঠিক বলতে পারেন না কেমন করে এই বরফের স্ফটিক তৈরী হয়।

তবে অনেকে মনে করেন এর প্রতিটি বিন্দুতে সেই বস্তুর কণা যে পরিমাণে থাকে সেই ভাবে এর আকৃতিপ্রকৃতি হয়। তাই বরফের এই স্ফটিক গুলিকে নানা আকারে দেখা যায়। বরফের স্ফটিকগুলি সাধারণত তিন কোনা কিংবা ছ'কোণা হয় আর তার মধ্যে তিনটি কিংবা ছ'টি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। আবার তারা একত্রিত হয়ে যে বরফের চাঁই সৃষ্টি করে অর্থাৎ তরল অবস্থার সেই বরফের কথা বলছি, তাদের কারুকার্য দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। এত সূক্ষ্ম, এত সুন্দর ও এত হিসাবসম্মত যে, অতি মূল্যবান জড়োয়া গহনায় কারুকার্যকেও তারা হার মানিয়ে দেয়। প্রকৃতির এই কারুকার্য দেখে জগতের শ্রেষ্ঠ কারীগররা পর্যন্ত হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু কি রকম করে যে তুষারের বুকে এই কারুকার্য ফুটে ওঠে তা আজো জানা সম্ভবপর হয়নি। তবে বৈজ্ঞানিকরা এই পর্যন্ত জানতে পেরেছেন যে, কোন্ অবস্থায় তারা কি রকম আকার ধারণ করে এবং তার বহু ফটোগ্রাফ তুলে পরীক্ষা করেছেন।

জেরিকো নামক স্থানে মিঃ ডবলিউ এণ্টলি বলে এক বৈজ্ঞানিক ১৮৮৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ৪৮০০ খানা তুষারের ছবি তুলেছিলেন। তোমরা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এদের কোন দুটি ছবিকেই এক রকম দেখতে নয়।

এই সব দেখে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন হয়ত কোন প্রবল ঝড় কিংবা ওই রকমের একটা কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে এই বরফের স্ফটিকগুলি তৈরী হয়—সম্পূর্ণরূপে ও নিখুঁত ভাবে। কিন্তু মাটিতে এসে পৌছবার পূর্বেই তাদের ওপর এত রকমের বাধা বিপত্তি এসে পড়ে যে, তারি ফলে তাদের আকৃতি প্রকৃতিতে ঘটে নানা রকমের পরিবর্তন। যেমন বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা ঘনতা যখন কম বেশী হয়, ঝড়ের গণ্ডীর মধ্যে এই সব তুষার স্ফটিকের তখন খুব ঠেলাঠেলি লেগে যায়, অথবা

যদি ওই রকমের আরো কোন অজ্ঞাত বাধা এসে পড়ে।

যাই হোক, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন আকৃতির হ'লেও বৈজ্ঞানিকরা এই তুষারগুলিকে মোটামুটি হু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক রকম হলো স্তম্ভাকার, আর এক রকম হলো সমচতুষ্কোণাকার। এছাড়া আর একটি মিশ্র সংস্করণ আছে যার মধ্যে এই উভয় রকমই পড়ে। এরা নানা ছাঁদের, নানা আকৃতির।

স্তম্ভাকার স্ফটিকগুলি কখন কখন হয় লম্বা ছুঁচের মত, কখন কখন তাদের ছ'টা ক'রে মাথা থাকে—আবার তাদের মধ্যে হয়ত একটা মাথা থ্যাবড়া রেকারের মত, তার ওপর একটা কি হু'টো স্ফটিক লেগে থাকে। তারা আরো অনেক প্রকার অদ্ভুত আকৃতির হয়। কিন্তু সব চেয়ে বেশী সুন্দর হ'লো সমচতুষ্কোণাকার শ্রেণী। এদের মধ্যে অসংখ্য ডিজাইন ও অদ্ভুত কারুকার্য পরিলক্ষিত হয়।

এত সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রকৃতির কোন্ কারীগর করলে, আজো তা ভেবে বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময়ের সীমা নেই!

তুষারের যে এমন রূপ তা আগে কে জানতো? বৈজ্ঞানিকরাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রকৃতির এই রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন জগতের সামনে। আজ মানুষ তাই সেই বৈজ্ঞানিকদেরই ধন্যবাদ দেয়, এই সৌভাগ্যের জন্য!

বাষ্পীয় শকট

বৈজ্ঞানিকদের মতে জগতের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হলো সময়। এক মুহূর্তের দাম একতাল সোনার চেয়ে বেশী। কত বড় পৃথিবী এবং তাতে কত কি রয়েছে দেখবার, শোনবার এবং শেখবার; অথচ মানুষের

পরমায়ু আর কতদিন! তাই সময় যাতে অযথা নষ্ট না হয় সেইজন্য তাঁরা দিনরাত প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে নিত্য নূতন যানবাহনের সৃষ্টি করছেন।

আজ যে মানুষ এখানে আছে কাল সে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটিকে একসঙ্গে দেখে আসছে। গতি চাই—আরো—আরো—বৈজ্ঞানিকদের এই হলো এখন একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও চিন্তা। তাই দ্রুতগামী যান তাঁরা দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছেন। আজ যে যানবাহনকে আমরা ভাবছি অতি দ্রুত বলে, কাল দেখছি তার চেয়ে আরো দ্রুততর যান বাহির হয়েছে। এই অতি দ্রুততার কবে শেষ হবে কে জানে। বৈজ্ঞানিকরা যেদিন একঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘুরে আসতে পারবেন সেদিনও বোধহয় খুশী হবেন না।

কিছুদিন আগে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী রেলগাড়ি ছিল জার্মাণীর। তার নাম হলো ফ্লাইং কলোগ্‌নার। বার্লিন থেকে হ্যানোভার এই ৫৭ মাইল পথ শুধু যাতায়াত করতো। তার গতি ঘণ্টায় ৮২৳ মাইল। তারপর একদিন ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস্‌ অফ্‌ আমেরিকা এই গতির প্রতিযোগিতায় জার্মাণীকে হারিয়ে দিলে। তারা সুপার্‌ চিফ্‌ এক্সপ্রেস্‌ বলে এমন একখানি গাড়ি বার করলে যার গতি ঘণ্টায় ৮৩ই মাইল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেণ এখন এইটি। স্যাণ্টা ফি রেলরোড দিয়ে এই গাড়ি চলে। ২০২ মাইল ৩৫২ গজ পথ—লা জুনটা থেকে ডজ্‌ সিটি পর্যন্ত যেতে সময় লাগে ১৪৫ মিনিট। যেখান থেকে ছাড়ে এবং যেখানে গিয়ে থামে তাতে গতির হিসাব দেখা গিয়েছে গড়ে মোটামুটী ঘণ্টায় ৮৩ মাইলেরও কিছু বেশী। এই দু'টী গাড়িতেই যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তার নাম ডিজেল্‌ ইঞ্জিন্‌।

এই সুপারচিফ্‌ রেলগাড়ি সপ্তাহে একবার চলে—উত্তর আমেরিকা

মহাদেশের চিকাগো সহর থেকে লস্ এঞ্জেলস্ পর্যন্ত—২,২২৮ মাইল পথ যেতে তার ৩৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লাগে।

কিছুদিন আগে যখন এই সুপার চিফ্ রেলগাড়ি প্রথম চলেছিল তখন পনেরো জন ইঞ্জিন ড্রাইভার ও তিরিশ জন ফায়ারম্যান্ যারা এই বাষ্পীয় শকট ডিজেল'এ কাজ করেছিল তারা আমেরিকাবাসীদের কাছ থেকে বহু সম্মান লাভ করেছিল। আজ পর্যন্ত যত রকমের বাষ্পীয়যান আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এই ডিজেল্ ইঞ্জিন্ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

বাস্তবিক এ যেন একটা চলন্ত 'পাওয়ার হাউস'। এর মধ্যে দুটো পৃথক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আছে। তাদের আবার এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন উভয় দিকেই তারা চলতে পারে। এদের প্রত্যেকটীর যন্ত্রপাতি সব স্বতন্ত্র।

এই ইঞ্জিনটীর ওজন ২৫০ টন এবং এর দৈর্ঘ ১২৭ ফুট। এর মধ্যে যে তেলের ইঞ্জিন আছে তার ক্ষমতাও বড় কম নয়—৩,৬০০ অশ্বশক্তি H. P. সম্পন্ন; আবার তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে সেই ইলেক্‌ট্রিক্ ডায়্‌নামো যার সাহায্যে চাকাগুলি ঘোরে।

এই অত্যাশ্চর্য গাড়িখানির প্রবর্তন ক'রে স্যাণ্টা ফি রেলরোড পৃথিবীর সমস্ত ট্রেণের গতির রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এই গাড়িটা হওয়ার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও দেশ পর্যটকদের ভারী সুবিধা হয়েছে। তারা গত তিরিশ বৎসর ধরে যে সব গাড়িতে চলাফেরা করতো তার চেয়ে এখন পাঁচ ঘণ্টা ন'মিনিট আগে পৌছতে পারে এই সুপার চিফের সাহায্যে।

এখন বহু বন্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এই গাড়িকে যেতে হয়। কিন্তু বহুদিন ধরে বহু সমস্যা সমাধান করবার পর সেখান দিয়ে এই গাড়ি চালান সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এর জন্য রেলের সমস্ত কর্মচারীরা বিশ্বস্ত-

ভাবে এবং অতি ধৈর্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে মাথা ঘামিয়েছিল।

কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটা অসুবিধা এই যে সকলস্থানে সহজে দ্রুতগতিতে যাওয়া যায় না, বিশেষ করে যেখানে রেলের বাঁধ বা পুল আছে। তাই এই গাড়িতে আবার সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা হলো। কিম্ লোকোমোটিভের পরিবর্তে, অয়েল্ ইলেক্‌ট্রিক্ লোকোমোটিভ্ বসলো। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখলেন এরদ্বারা সর্বত্র অতি দ্রুতগতিতে যাওয়া যাবে, তাছাড়া এতে কয়লা ও জল নেবার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই মরুভূমি অঞ্চল দিয়ে যেতেও এর কোন অসুবিধা হবে না।

শত শত মাইল নতুন রেল পথ বসলো এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হলো শুধু এই গাড়িটী যাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারে তার জন্য।

নতুন ইঞ্জিনের নিরাপত্তার জন্য নতুন করে রেল লাইন বসলো—আমাদের দেশের রেলকর্তৃপক্ষের কাছে হয়ত মনে হতে পারে কি দরকার ছিল এই বাজে খরচের! কিন্তু এ কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা অসত্য আছে জানি না; তবে ও দেশের লোকদের মনের ভাব অন্য রকম! পুরণো লাইন দিয়ে যে সে গাড়ি একেবারে চলতো না তা নয়। তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন কি জানি যদি কোন বিপদ হয়!

নতুন গাড়ির জন্যে নতুন ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিশেষত শত শত মানুষের জীবন যে গাড়ির মধ্যে বদ্ধ রয়েছে সেখানে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ রাখা ঠিক নয়। এতদিন যে ইঞ্জিন যে লাইনের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে এসেছে আজ যখন সে ইঞ্জিন বদলেছে তখন লাইনও তথোপযুক্ত হওয়া উচিত! এতটা ভেবে চিন্তে তবে কাজ করে ব'লে ওখানের রেলে দুর্ঘটনা ঘটে না বললেই হয়। আমাদের দেশের মত ওদেশের গাড়িতে উঠতে গিয়ে লোকের বুক কেঁপে ওঠে না। মানুষের জীবনের মূল্য তাদের কাছে সবচেয়ে বেশী!

তাই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই সুপারচিফ্ গাড়িটি এত খ্যাতি

অর্জন করেছে যে, গাড়ি ছাড়বার বহু আগে থেকেই যাতায়াতের সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে যায়। গাড়িতে একটীও আসন আর খালি পড়ে থাকে না—সমস্তই লোকে পূর্বাহ্ণে রিজার্ভ করে ফেলে।

এ ছাড়া আর একটা কথা শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এই সুপার চীফ্ ইঞ্জিনের মধ্যে ডবল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তার পিছনে আর একটি ইঞ্জিন্ সর্বদা রিজার্ভ রাখা থাকে। যদি কোন স্থানে প্রয়োজন হয় অত্যধিক শক্তির তখন এইটি তাতে যোগ করে দেওয়া হয়। এই রেলপথের এক জায়গায় কলোরাডো নামক স্থানে এগারো মাইল পথ ঘণ্টায় ১০৮ মাইল গতিতে এই সুপার চিফ্ চলে। তখনো কিন্তু এই অতিরিক্ত ইঞ্জিনটি চালাবার দরকার হয় না। একাই নিয়ে যায় সুপার চিফ্!

অবশ্য ব্রিটেনের তুলনায় আমেরিকার এই রেল লাইনগুলি ঢের কম ব্যবহৃত হয়। ব্রিটেনের প্রতি মাইলে প্রতিদিন গড়পড়তা চুয়ান্নো-খানি গাড়ি চলে, আর আমেরিকায় তার স্থলে মাত্র ন' খানি। ব্রিটেনের সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের নাম চেল্‌টেনহ্যাম্ ফ্লায়ার্—ঘণ্টায় ৭১·৩ মাইল গতিতে চলে। এছাড়া সিলভার জুবিলী এক্সপ্রেসখানি ২৩২ মাইল ৪৪০ গজ পথ অতিক্রম করে—আসা ও যাওয়ায় মোট ১৯৮ মিনিটে—কিংস্‌ক্রশ্ থেকে ডারলিংটন্। এর গতি হ'লো মোটা-মুটি ঘণ্টায় ৭০·৪ মাইল। কিন্তু এই সিলভার্ জুবিলীও তার নিয়মিত পথে চলতে চলতে এক একবার ১১৩ মাইল গতিতেও চলে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যদিও আজ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের সম্মানলাভ করেছে ইউনাইটেড্ স্টেটস্ তবুও পৃথিবীর দীর্ঘতম রেললাইনে গাড়ি চলাচল করবার সম্মান ব্রিটেন দাবী করতে পারে।

যত দিন যাচ্ছে ততই এর গতিও বাড়ছে। গত পাঁচ বছরে যা বেড়েছে আবার আসছে পাঁচবছরে হয়ত বা আরো বাড়বে—কে জানে! বৈজ্ঞানিকরা অসাধ্যসাধন করতে পারেন। তাঁরা দীর্ঘজীবি হোন!

মাধ্যাকর্ষণ

আজ যদি কেউ তোমাদের কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ওজন কত ? সে হয়ত তৎক্ষণাৎ বলবে একমণ কি তার চেয়ে পাঁচ দশ সের কম বেশী। মোটকথা যে সব ওজনের কল রাস্তায় ধরে, রেল স্টেশনে, বাজারে কিংবা ডাক্তারখানায় আছে সেখান থেকে ওজন হ'য়ে সে যা জানতে পেরেছে তাই বলে। অবশ্য এইভাবেই সকলের দেহের ওজন বা আসল ভার স্থির হয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন এ উত্তর ঠিক হলো না। তোমাদের দেহের ওজন কিছু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। দেহের ভার সমস্তটাই নির্ভর করে যে স্থানে ওজন হওয়া যায় তার ওপর।

কাজেই এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্নটা যত সহজ, তার উত্তরটা কিন্তু তেমন নয়।

কথাটা অত্যন্ত রহস্যময় মনে হলেও এর মধ্যে থেকে একটা সম্পূর্ণ নতুন জগত তোমাদের চোখের সামনে এখনি বিস্ময়ের দ্বার খুলে এসে দাঁড়াবে। তোমরা দেখে অবাক হয়ে যাবে তার অভিনব রূপ ! বিজ্ঞান আজ কোথায় গিয়ে পৌচেছে তখন সহজেই বুঝতে পারবে।

বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন লণ্ডন, অক্সফোর্ড বা ম্যানচেষ্টারে যে ছেলের ওজন একমণ সে যদি উত্তর মেরুতে যায় ত তার ওজন আরো এক আউন্স বাড়বে। আর পৃথিবীর মধ্যরেখার বা বিষুবরেখার যত কাছে সে থাকবে তত তার ওজন কমবে—এক আউন্স কি তার চেয়েও কম। এছাড়া বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যে কোন লোক বা যে কোন জিনিষ জীবিতই হোক বা মৃতই হোক মাটির ওপর থাকলে তার একরকম ওজন, আবার মাটির ওপর থেকে

উঁচুতে উঠলে আর একরকম ওজন—এমন কি শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে, যখন তোমরা নীচের ঘর থেকে ওপরের ঘরে শুতে যাও তখনও তোমাদের ওজন কিছু কমে যায়। মাটির ওপর থেকে প্রায় দশ টন বা ৩৫০,০০০ আউন্স ভারী কোন জিনিষকে যদি তোমরা তিরিশ ফুট উঁচু কোন জায়গায় নিয়ে যাও তাহলেও দেখবে তার ওজন কমে গিয়েছে অন্তত এক আউন্স।

অবশ্য এই ওজন তুচ্ছ অতি সামান্য, এর দ্বারা সংসারে বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। এমন কি হয়ত এই তফাতটুকু মানুষ বুঝতেই পারে না। তবু বৈজ্ঞানিকরা আজকাল এমন একরকম ওজনপাল্লা আবিষ্কার করেছেন যে, তাতে করে অতি সূক্ষ্ম জিনিষও পাশাপাশি রেখে ওজন করলে একরকম, আবার একটার ওপর আর একটা রেখে ওজন করলে অপর একরকম ফল পাওয়া যায়। ওজনের এই তারতম্যটুকু সামান্য হলেও কিন্তু এর সত্যটুকু মোটেই সামান্য নয়। কেননা এই হিসেব থেকেই ভবিষ্যতে অনেক কিছু বৃহৎ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে বৈজ্ঞানিক-জগতে।

তবে আধুনিক বিজ্ঞান এই থেকে অধিকতর বিস্ময়কর প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে মানুষের চোখের সামনে।

আগেই বলেছি যে মানুষের ওজন বেশীরভাগ নির্ভর করে যে স্থানে সে ওজন হয় তার ওপরে। বেশীর ভাগ হলেও কিন্তু সবটা নয়।

কেননা এই ওজনের অনেকটা আবার নির্ভর করে আকাশের চাঁদের ওপর। ওজনের সময় চাঁদ যদি ঠিক মাথার ওপর থাকে তাহলে ভারও কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় জাহাজ কুইনমেরীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে, এই জাহাজখানির ওজন প্রায় ২০ পাউণ্ড কমে যায় যখন সে ঠিক চাঁদের নীচে আসে। আবার যখন চাঁদ দূরে

দিকচক্রবালে থাকে তখন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ১০ পাউণ্ড বাড়ে। মোট কথা চাঁদ যখন ওঠে তখন থেকে সুরু করে আকাশের মাঝখানে আসা পর্যন্ত এই জাহাজখানিতে মোট ৩০ পাউণ্ড ওজনের তারতম্য ঘটে। আর এইটুকু তফাৎ হবেই—তা জাহাজ যেখানেই থাকুক না কেন—আটলান্টিক মহাসাগরের বক্ষে কিংবা কোন বন্দরে।

তাহলেই বুঝতে পারছ যে, একই জায়গায় থেকে তোমাদের দেহের ওজন দিনের মধ্যে যতবার নেওয়া যাবে ততবারই কম বেশী হবে —কখনই একরকম হবে না।

এর অর্থ কি? এর কি কোন নিয়ম নেই—এমনি শুধু শুধু হয়?

না, তা নয়। এর নিয়ম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা বলবার আগে ভালোকরে জানা দরকার ওজন জিনিষটা কি?

ওজন সম্বন্ধে বলতে গেলে এক কথায় বলতে হয়, পৃথিবীর অতি রহস্যময় একপ্রকার আকর্ষণশক্তি, বৈজ্ঞানিকরা যার নাম দিয়েছেন মাধ্যাকর্ষণ। কোন বস্তুর ওজন আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দুইই এক। তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আর যত বড় এবং যত ছোট জিনিষই হোক জীবিত অথবা মৃত সকলের মধ্যেই এই আকর্ষণশক্তি আছে। তাঁরা বলছেন, এই পৃথিবীর ওপরে যে সব বস্তু দেখছ তাদের প্রতিবিন্দু সর্বদা পৃথিবীর অন্য বস্তুর প্রতিবিন্দুকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু কেন করছে এবং কেমন করে করছে, সেটা আজ পর্যন্ত সকলের কাছে অজ্ঞাত। তবে সবাই এটা ধরে নিয়েছেন স্বতঃসিদ্ধ বলে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই আকর্ষণশক্তি বা চুম্বকপ্রভাবই হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের মধ্যে প্রথম ও প্রধান বস্তু!

প্রকৃতির সমস্ত নিয়মের মধ্যে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই হচ্ছে প্রধান। তোমরা বোধহয় জানো যে, এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম স্যার আইজ্যাক্ নিউটন্। কি করে

তাঁর মাথায় প্রথম এই চিন্তা এসেছিল তার গল্পও নিশ্চয়ই তোমরা কোন না কোন বইয়ে পড়েছো।

একটী পাকা ফলকে গাছ থেকে মাটীতে পড়তে দেখে তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হলো, কেন ফলটী মাটিতে পড়লো? তারপর ভাবতে ভাবতে একদিন তিনি এই অত্যাশ্চর্য শক্তিটির সন্ধান পেলেন। নিউটনের আবিষ্কৃত এই মাধ্যাকর্ষণশক্তির কথা শুনে সমস্ত জগত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা স্থির করলেন যে, ওই আকাশের গায়ে যে সব সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে প্রত্যেকেরই মধ্যে গতি আছে, তাই তারা স্থান পরিবর্তন ক'রে—এখানে ওখানে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য এর হিসাব খুব জটিল এবং দুরূহ, সকলে সহজে বুঝতে পারে না।

কিন্তু সকলে বুঝতে না পারলেও যে এই নিয়মগুলি সত্য তার প্রমাণ আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি।

আজ থেকে শত শত বৎসর পরে কবে কোন গ্রহ নক্ষত্র আকাশের কোথায় থাকবে—কবে চন্দ্রগ্রহণ হবে, কোন্ লগ্নে সূর্য্যগ্রহণ ঘটবে, সমস্তই বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে বলে দিচ্ছেন—শুধু এই নিয়ম থেকে। আবার গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা কখন এবং কি ভাবে আসবে তাও জানা সম্ভব হয়েছে এই নিয়ম থেকে। তা'হলে বুঝতে পারছো যে, মাধ্যাকর্ষণশক্তির ওপর অবিশ্বাস করার আর কোন উপায় নেই।

এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি বা পৃথিবীর টান আছে বলেই কোন লোক দশ মণ ওজনের বোঝা ঘাড়ে করে ওপরে উঠতে পারে না, আর সেইজন্য যে কোন কঠিন বস্তুকে আকাশের দিকে খুব জোরে ছুঁড়ে দিলেও সে মাটিতে এসে পড়বেই। এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার

হওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক জগতের যে কি প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে তা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকদের চোখে নিউটন তাই দেবতা স্বরূপ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির সর্বত্রই এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি রয়েছে —তবে সব জায়গায় সমান নয়, স্থান কাল পাত্রভেদে এর কম বেশী হয়। যেমন বড় বড় বস্তুর আকর্ষণশক্তি বেশী তেমনি ছোটর কম—এ তোমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারো। তাছাড়া পৃথিবীর ভারকেন্দ্র থেকে যে বস্তু যতদূরে থাকে তার মাধ্যাকর্ষণও তত কম হয়। এবং মানুষের বেলাও ঠিক সেই নিয়ম খাটে। তাই কোন জিনিষের ওজন বলতে বোঝায়, সেই শক্তি যার দ্বারা পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে তার দিকে। এর কারণ পৃথিবী অন্য কোন বৃহৎ বস্তুর কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে অথচ আমাদের খুব কাছে আছে। আমরা তাকে স্পর্শ করছি এবং তার ওপর বাস করছি। কিন্তু পৃথিবীর সমতুল্য অন্য পদার্থ যা আমাদের বা পৃথিবীর সন্নিকটে আছে তাহলো একমাত্র চাঁদ। পৃথিবী থেকে মাত্র দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই চাঁদ ওপর থেকে পৃথিবীকে টানছে আর পৃথিবী নীচে থেকে চাঁদকে টানছে। দু'জনের মধ্যে অনবরত একটা শক্তির প্রতিযোগীতা চলেছে।

সেইজন্য বিলেতের সবচেয়ে বড় জাহাজ 'কুইনমেরী'র ওজন তিরিশ পাউণ্ড কমে যায়। মানে, একদিন থেকে যেমন চাঁদ চাইছে 'কুইনমেরীকে' তার দিকে আকর্ষণ করতে, অন্যদিক থেকে তেমন চাইছে পৃথিবী। এখন বেচারী জাহাজ কোন দিকে যায়? চাঁদের চেয়ে পৃথিবী বড়। কাজেই পৃথিবী সর্বদা জিতছে। কারণ তার আয়তন বড়—ফলে আকর্ষণশক্তিও বেশী। আর চাঁদের শক্তি অল্প হলেও সে তাইদিয়ে খানিকটা টেনে রাখছে। সেই জন্য চাঁদের ঠিক নীচে এই জাহাজ গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ওজন কুড়ি পাউণ্ড কমে যায়

আর চাঁদ থেকে যত দূরে যায় তত তার ওজন বাড়তে বাড়তে ক্রমে দশ পাউণ্ড পর্যন্ত বেশী হয়।

আরো সহজে বলতে গেলে এই রকম দাঁড়ায়। যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সবচেয়ে প্রবল সেইখানে তোমাদের ওজনও সবচেয়ে বেশী। আবার যেখানে কম সেখানে তোমাদের দেহের ওজনও কম। অর্থাৎ ওজন কম বেশী হওয়ার সমস্তটা নির্ভর করে এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি বাড়া-কমার ওপর। এবং যেহেতু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এক এক স্থানে এক এক রকম সেইহেতু তোমাদের দেহের ওজনও এক এক জায়গায় এক এক রকম।

তোমরা জানো বোধহয় যে, পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়—যেমন বিষুবরেখার দিকে অল্প ঢুকে এসেছে তেমনি আবার উত্তর দক্ষিণ মেরুর দিকে সামান্য চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তাই লণ্ডনে তোমার ওজন যা হবে উত্তরমেরু গেলে তার চেয়ে কিছু বেশী হবে। কারণ মাধ্যাকর্ষণ বা পৃথিবীর ঠিক ভারকেন্দ্র থেকে উত্তরমেরু বা দক্ষিণমেরুটা ব্রিটেন অপেক্ষা আরো ছ,সাত মাইল কাছে। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে যে, ওই দুই প্রান্ত চ্যাপ্টা হওয়ার দরুণ ভারকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর মধ্য-রেখা বা বিষুবরেখা আরো ছ' সাত মাইল দূরে চলে গেছে ব্রিটেনের চেয়ে। কাজেই যত তুমি মাধ্যাকর্ষণ থেকে দূরে যাবে তত তোমার ওপর এই আকর্ষণ বা প্রতিযোগিতার শক্তি হবে কম; সেইজন্য তোমার ওজন সামান্য পরিমাণে বাড়তে বাধ্য।

এই একই নিয়মে যখন তুমি চারতালা কিংবা তিনতালার ঘরে থাকো তখন তোমার দেহের যে ওজন থাকে নিচের তলায় এলে তার-চেয়েও বাড়ে। কেন না তুমি তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র থেকে কয়েক গজ দূরে থাকো।

পৃথিবীর বয়স

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটা যে একদিনে কেউ তৈরী করেনি, এ সহজ তথ্যটা আশাকরি তোমরা অনেকেই অনুমান করতে পারো। কেননা আমরা জানি এবং তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে সামান্য একটা চালাঘর করতে ক'দিন সময় লাগে, আর কত জিনিষের দরকার হয়! কলকাতার বড় বড় অট্টালিকার কথা ত ছেড়েই দিলুম।

কাজেই যে পৃথিবী এত বড় এবং যার ওপরে এত সব পাহাড়-পর্বত, নদী-বন, প্রান্তর-মরুভূমি, সাগর-আগ্নেয়গিরি রয়েছে সে যে অল্পদিনে তৈরী হয়নি তা একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেই বোঝা যায়। তার ওপর আবার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ রকমের জীবজন্তু কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ—অতিকায়, অতিক্ষুদ্রকায়ও যে কত তা বোধহয় আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক নির্ণয় করতেই পারেন নি।

এছাড়া আবার গাছপালা ও জীবজগতের বিভিন্ন রূপের কথা মনে হলে জ্ঞান থাকে না। একটা প্রাণীর সঙ্গে আর একটা প্রাণীর মিল নেই—দৈহিক-গঠনে, আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, আহারে বিহারে—সবাই স্বতন্ত্র, সবাই এক একটা পৃথক শ্রেণী।

কাজেই সহজে বোঝা যায় যে. এই পৃথিবীটি তৈরী হতে অনেক—অনেকদিন—সময় লেগেছে।

কিন্তু কতদিন?

এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বহুদিন ধরে বহু গবেষণা করে স্থির করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স মাত্র কুড়ি কোটি বছর।

আমি বেশ বুঝতে পারছি এই সংখ্যাটির কথা শুনে তোমরা বিস্মিত হচ্ছো! কিন্তু এতে বিস্ময় প্রকাশ করবার কিছু নেই। কেননা

বৈজ্ঞানিকরা যে প্রথায় এই হিসাব করেছেন সেটা অতি সোজা—তোমরাও এক মিনিটে বুঝতে পারবে। তোমরা জানো মানুষের বয়েসের হিসাব লেখা থাকে ঠিকুজীতে—মজবুত কাগজে কিন্তু তাও একদিন পোকায় কেটে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু পৃথিবীর বয়সের হিসাব লেখা হয় পাথরের বুকে—এমন কোন শক্তি নেই যে, তাকে নষ্ট করতে পারে। তাই যেদিন এই ঠিকুজীর ভাষা বৈজ্ঞানিকরা পড়তে শিখলেন সেইদিন তাদের কাছে সমস্তই সহজ হয়ে গেল।

কি রকম করে তাই বলছি।

মিশরের রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে মেম্পাসের ধারে মাটি যতখানি উঁচু ছিল আজ তা থেকে মাটি আরো অনেক উঁচু হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখেছেন যে, সেই মাটি বা পাথরের স্তর দু'ফিট পরিমাণ জমা হ'তে গড়পড়াতা এক হাজার বছর লাগে। তারপর তাঁরা দেখলেন যে, এইভাবে তিল তিল করে জমে যে সব পাথারের স্তর পাওয়া গিয়েছে তা যদি একসঙ্গে করা যায় তা হ'লে তার গভীরতা হবে চার লক্ষ ফিট। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ভূতত্ত্ববিদরা নানা জায়গা থেকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করে তবে হিসাব সঠিক করেছেন। এখন সোজা 'রুল অফ থ্রী'র অঙ্ক কষে নাও। ২ ফিট গড়তে যদি ১০০০ বছর লাগে ত চার লক্ষ ফিট গড়তে কতদিন সময় লাগবে?

তা ছাড়া মাদাম কুরী যে রেডিয়াম্ আবিষ্কার করেছেন তা থেকেও পৃথিবীর বয়সের হিসাবটা আজ সহজ হয়ে গেছে। এই রেডিয়াম্ থেকে হিলিয়াম্ নামক একরকম গ্যাস অনবরত বার হয় এবং এইভাবে এই গ্যাস বার হ'তে হ'তে রেডিয়ম একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীসায় পরিণত হয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের রেডিয়াম ও সীসার অনুপাত কষে এখন ভূতত্ত্ববিদরা স্থির করতে পারেন কি অনুপাতে সেই

স্তরে রেডিয়াম সীসায় পরিণত হয়েছে আর কত সময়ই বা তাতে লেগেছে !

এই রেডিয়াম পদ্ধতিতেও দেখা গিয়েছে পৃথিবীর আদিমস্তরের পাথর প্রথম দেখা দেয় প্রায় কুড়ি কোটি বছর পূর্বে।

তোমরা এই হিসাবটা আরও সহজে বুঝতে পারবে যদি পৃথিবীর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হও। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, পৃথিবীর গঠন অনেকটা পেঁয়াজের মত—স্তরের পর স্তর দিয়ে তৈরী। মাটি, পাথর, ধাতু, বরফ প্রভৃতি নানা নামে সবশুদ্ধ ছয়টি স্তর আছে এবং এদের এক একটি পুরু এক এক রকমের। কোনটি দেড়শো মাইল, কোনটি দু'শো মাইল, কোনটি বা আড়াইশো মাইল। এসব এখন তোমাদের সঠিক জানবার প্রয়োজন নেই। বড় হ'য়ে শিখো, তবে মোটামুটি বয়সের হিসাব হয় এইভাবে জেনে রেখো।

আমেরিকার 'ব্যাফেলো ম্যুজিয়াম্ অফ্ সায়েন্স'এ এর দু'টী তালিকা আছে। এই দু'টি এখন ভূতত্ত্বের চূড়ান্ত হিসেব বলে পৃথিবীর লোকেরা মেনে নিয়েছেন। এদের একটির নাম 'চার্ট্ অফ্ জিয়োলজিক হিষ্ট্রি', অপরটির নাম 'রেকর্ড্ অফ্ রকস্'। চার্ট্ অফ্ জিয়োলজিক হিষ্ট্রি থেকে জানতে পারা যায় কবে থেকে জীবনের প্রথম স্ফূরণ হয়েছিল এই পৃথিবীর বুকে—এর ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার সম্পূর্ণ বিবরণও তাতে সঠিক লেখা আছে।

আর 'রেকর্ড্ অফ্ রক্স' থেকে জানতে পারা যায় পৃথিবীর বুকে কবে কে এসেছিল। তদের সেই আবির্ভাব প্রস্তরীভূত হয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরে পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাছাড়া গাছপালা ও জীবজন্তুর জন্ম ও ক্রমোন্নতি কেমন করে হয়েছিল তাও এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে মানুষ। তারা পৃথিবীর ওপর সব শেষে এসেছে অথচ সকলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

পৃথিবীর ওপর নবাগত হ'লেও তারা এর শাসনকর্তা হয়েছে এবং সকলকে শাসন করছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মনে হয় এই সেদিন মানুষ এসেছে পৃথিবীতে বরফ যুগে বা তার সামান্য কিছু পূর্বে। তাদের কঙ্কাল প্রস্তরীভূত হয়ে পাথরের বুকে সুরক্ষিত হয়েছিল। তাই আজ জগতের লোকের কাছে আদিম মানুষের ইতিহাস অজ্ঞাত, তাদের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই আমরা জানতে পারি না।

ভূতত্ববিদদের কথায় বলতে গেলে সমস্ত সৃষ্টিটা চাকার মত ঘুরছে, আর মানুষ সেই সৃষ্টিচক্রের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। শীগ্‌গিরই তা একটা দারুণ ধ্বংশের মুখে এসে পড়বে। তাঁরা বলছেন কিছুকাল পরে শত শত গ্রাম, নগর এবং সমুদ্র তীরবর্তী স্থানগুলি নাকি জলের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ ছাড়া বৈজ্ঞানিকরা আরও আশঙ্কা করছেন যে পৃথিবীর এই আবহাওয়া বদলে গিয়ে এমন এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করবে মৃদু সভাবাপন্ন সবই হবে ও সৌসাম্য মণ্ডিত। যেখানে উগ্রতা বলতে কিছু থাকবে না তখন আর গগনচুম্বী পর্বতশ্রেণী থাকবে না, তার জায়গায় নীচু নীচু ছোট ছোট পাহাড় পৃথিবীর শোভাবর্দ্ধন করবে।

কিন্তু তাই বলে এখনই তোমাদের এত ভয় পাবার কারণ নেই। এই ধ্বংশ সাধিত হতে এখনো হাজার লক্ষ বছর সময় লাগবে অন্তত ভূতত্ত্ববিদরা গবেষণা করে তাই দেখেছেন।

প্রথম মানুষ

ভগবানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'লো এই মানুষ! তোমরা জানো যে পৃথিবীতে আরো কত শত শত রকমের জানা-অজানা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। যদিও প্রাণ যাদের আছে

এমন জীবমাত্রকেই প্রাণী এই আখ্যা দেওয়া হয়, তবুও তারমধ্যে মানুষ একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী বা পর্যায়। ভগবান নাকি একে একে সমস্ত সৃষ্টি করবার পর এই মানুষকে পাঠান পৃথিবীতে এবং এই তাঁর সুন্দরতম, সুসম্পূর্ণ ও সর্বশেষ সৃষ্টি। কোন কোন ধর্মগ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে যে, অবশেষে ভগবান নিজেকে সৃষ্টি করলেন মানুষরূপে! ব্যস, তারপর তিনি হাত ধুয়ে ফেললেন।

তাই মানুষ হ'লো শ্রেষ্ঠ জীব আর বাকী সব নিকৃষ্ট বা ইতরপ্রাণী!

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা একথা মেনে নিতে চান না। তাঁরা বলেন ওসব আমরা বিশ্বাস করি না, প্রত্যেকেরই পূর্বপুরুষ আছে—আর প্রত্যেকেরই বংশের ধারা চলে আসছে সেই প্রথম যেদিন 'প্রাণ' এর সৃষ্টি হয়েছিল সেই আদিযুগ থেকে।

এখন এই 'প্রাণ' এর বিকাশ হয়েছে যাদের ভেতর তারাই হ'লো প্রাণী। এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে অতি বৃহদকায় জীবজন্তু এমন কি মানুষ পর্যন্ত এই পর্যায়ভুক্ত। তবে মানুষই হলো এই প্রাণী-জগতের শেষসৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন জীবসৃষ্টি এইখানেই তার সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য এই স্তরে পৌঁছতে প্রাণী জগতের বহুদিন সময় লেগেছিল—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর।

এই একটা থেকে আর একটা স্তরে রূপান্তরিত হওয়াকে বলে জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যে দশ অবতারের স্তোত্র আছে পণ্ডিতেরা বলেন তাও নাকি এই বিবর্তনের কাহিনী। ইংরেজীতেও এই স্তরগুলিকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নামগুলি এমন ভাষায় লেখা যে, উচ্চারণ করা দুরূহ, তাই এখানে সেগুলির আর উল্লেখ করলুম না।

তবে সহজেই বোঝা যায় যে, এই স্তরগুলি সম্পূর্ণ হ'তে যখন এতদিন সময় লেগেছে তখন নিশ্চয়ই তার একটা শুরু ও একটা

শেষ বা পরিণতি আছে।

তাই অনেক গবেষণার পর তাঁরা স্থির করলেন, মানুষের পূর্বপুরুষ হ'লো বানরের মত এক রকমের জানোয়ার যাদের বলা হয় 'এপ্'। তাদের দৈহিক গঠন হুবহু মানুষের মতন এবং ছোট ছোট দু'চারটে অভ্যাস ও কয়েকটা ভাবভঙ্গী একেবারে অবিকল মানুষেরই নকল বলে মনে হয়। তবে দেখতে তাদের ভারী কুৎসিত, আর ভাবভঙ্গী-গুলো এমন অসভ্য ও বিরক্তিকর যে মনে হয় যেন মানুষকে তারা সর্বদা ভেঙ্চি কাটচে। বুদ্ধিতে অবশ্য তারা ইতর প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু মানুষের কাছে তা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই 'এপ'দের মাথার খুলিতে বুদ্ধির যে স্থানটি আছে তা মানুষের বুদ্ধির স্থানের চেয়ে অনেক ছোট—এক চতুর্থাংশেরও কম। তাছাড়া তাদের কঙ্কালের সঙ্গেও মানুষের কঙ্কালের অদ্ভুত মিল আছে।

কিন্তু এই 'এপ'রা মানুষের পূর্বপুরুষ হ'লেও তবু বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মানুষ ও এদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা' থাকা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এদের মধ্যে থেকে কোন একটা 'শ্রেণীবিশেষ' হারিয়ে গেছে। তাই এই হারানো সম্প্রদায়কে তাঁরা আজো খুঁজছেন। কোন্ দিন যে হিসেবমত মিলবে তা কে বলতে পারে!

যাক, আবার উপস্থিত এই যে 'এপ' এরা হ'লো চার রকমের—গরিলা, শিম্পানজী, ওরাং-ওটান ও গিব্বন। প্রথম তিনটির শ্রেণী হ'লো যেমন বড় গিব্বন তেমনি ছোট। আর এর পরই হ'লো বাঁদর শ্রেণী।

এখন 'এপ'দের বুদ্ধির একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। নিউইয়র্কের চিড়িয়াখানায় একটা শিম্পান্জী আছে। তাকে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে সে কি-রকম কাজের লোক হ'য়ে পড়েছে। চিড়িয়া-খানার কেরাণীদের সঙ্গে সে সমানে কাজ করছে। সে টাইপ করে

মিনিটে ষাটটি কথা !

এখন কেমন করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সেই-কথা বলছি।

পূর্বে তোমরা পড়েছ মাটির স্তর দেখে ভূতত্ত্ববিদ্‌রা কি রকম করে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করেন। হল্যাণ্ডে একজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁর নাম ইউজিন্ ড্যুবয়্। তিনি মানুষের সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। তাই প্রথমেই এই মানুষগুলো কোথা থেকে এলো সেই তথ্য আবিষ্কার করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বহুদিন ধরে বহু পুঁথি পত্তর ঘেঁটে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মানুষ যে যুগে প্রথম দেখা দিয়েছিল তার স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে জাভা অঞ্চলে।

মানচিত্রে বর্মা ও শ্যাম প্রদেশের নীচে যে দ্বীপপুঞ্জগুলি আছে তারি মধ্যে একটি হ'লো জাভা। তখন তিনি একটা চাকরী নিয়ে জাভায় চলে গেলেন এবং বেঙ্গওয়ান্ বলে সেখানে যে নদী আছে তার তীরে মাটি খুঁড়তে লাগলেন।

কিন্তু কোথায় মানুষের চিহ্ন? যত মাটি খোঁড়েন তত কেবল মাটিই ওঠে। তবে কি ভুল হ'লো! ডাক্তারসাহেব আবার হিসাব কষতে বসলেন। না—তাতো হ'তে পারে না। তিনি দেখলেন তাঁর গণনাই ঠিক। কাজেই লোকজনকে হুকুম করলেন আরো মাটি খুঁড়তে—আরো গভীরে চলে যেতে।

শেষে এক সময় ঠং ক'রে উঠলো কোদাল কিসে লেগে। কাদার মধ্যে থেকে প্রথমে বেরুল একটা মাথার খুলি, উরুতের হাড় এবং দাঁতের পাটি। তারপর আর একটু পরেই সেইখানেই পাওয়া গেল তার অবশিষ্ট কঙ্কালের অংশ। ডাক্তারসাহেব আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন পেয়েছি পেয়েছি বলে। এই হ'লো নাকি জগতের প্রথম মানুষ!

জাভা দ্বীপে পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম হ'লো জাভা-ম্যান।

কেউ কেউ আবার বলেন ট্রিনিলম্যান। যে গ্রামে সেই হাড়গুলি পাওয়া গিয়েছিল তার নাম ট্রিনিল। যে মাটির স্তরে তাকে পাওয়া গিয়েছিল তা পরীক্ষা করে ভূতত্ত্ববিদরা দেখেছেন যে সাড়ে চার লক্ষ বছর আগে এই মানুষটি পৃথিবীতে এসেছিল। কাজেই আমরা বলতে পারি যে জাভা মানুষটির বয়েস এখন সাড়ে চার লক্ষ বছর।

এই মানুষের পূর্ব পুরুষের কঙ্কালের সঙ্গে আরো বহু বানরের কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছিল। তবে এর কঙ্কালটার একটা বিশেষত্ব ছিল। বড় জাতায় বানরের মত হলেও এ খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারতো। তাছাড়া ব্রেণ বলে বানরদের কিছু নেই। কিন্তু এর মাথার খুলিতে একটা ছোট্ট ব্রেণের জায়গাও ছিল, যদিও পূর্ণ মানুষের তুলনায় তা খুবই ছোট। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বানরদের চেয়ে সে ছিল স্বতন্ত্র একটা জাতের—যা বানরও নয়, মানুষও নয়। এই যে আমাদের পূর্ব-পুরুষ এ কথাটা জোর করে কোন বৈজ্ঞানিকই অবশ্য বলেন না। তবে মানুষের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এর দেহ লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি এবং ওজন এগারো ষ্টোন বা একমণ সাঁইত্রিশ সের। এক একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে এদের জাতকে জাত নাকি শেষ হয়ে যায়। আবার আসে এক নতুন জাত।

এরপর আরো বহু বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণা করেছিলেন মানুষের ইতিহাস জানবার জন্য। এবং তাঁরা আরো পাঁচজন পৃথিবীর পুরণো মানুষের চিহ্নও পেয়েছিলেন। কোথায় এবং কেমন করে সেই মানুষ-গুলি পাওয়া গিয়েছিল বলছি।

দ্বিতীয় মানুষটির নাম বৈজ্ঞানিকরা রেখেছেন হিডেন্‌বার্গ-ম্যান। হিডেনবার্গ অঞ্চলে এর হাড় পাওয়া গিয়েছিল। বেঁচে থাকলে তার বয়েস আজ হতো সাড়ে তিন লক্ষ বছর! গোটেনসাফ্‌ নামে একজন জার্মান ডাক্তার একে আবিষ্কার করেন। এর শুধু মুখের একটা চোয়াল

পাওয়া গিয়েছিল। আর তাই ধরে বহুদিন পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা এর জ্ঞাতিগোষ্ঠি জাত আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই নির্ণয় করেছেন।

এরপর যে মানুষটির সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম নিয়ানডারথ্যাল-ম্যান, কেউ কেউ আবার পিনট্‌ডাউনম্যান্ বলেন। জার্মানীতে যে রাইন নদী আছে তার একটা শাখার নাম নিয়েন্‌ডার নদী। এরই ধারে একটা গর্তের মধ্যে ডাঃ ফুহ্‌লরট্ কতকগুলো হাড়গোড় সমেত একটা মাথার খুলি পান। কিন্তু প্রথমে কেউই স্বীকার করতে চান না যে এটা মানুষের হাড়গোড়। তারপর এরকমের আরো বহু হাড়গোড় ষাট বছর ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যেতে লাগল।

শেষে এ সম্বন্ধে যখন সবই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় ইংল্যাণ্ড থেকে এই রকমের একটা মানুষের খুলি পাওয়া গেল। লিউইস্ অঞ্চলে 'পিলট্‌ডাউন কমন' নামক একটি স্থান আছে, সেখানকার এক মাঠ থেকে চার্লস্ ডসন্ বলে একটি লোক এইটি আবিষ্কার করেন।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন হিডেনবার্গ মানুষের যুগেও এই জাতীয় মানুষ ছিল। তবে তাদের সমস্ত বংশ লোপ পাবার পরেও এই পিল্‌টডাউন-ম্যান অনেক দিন বেঁচে ছিল। এরা নাকি মানুষের মত কথাবার্তা কইতে পারতো। এদের বলা হয় The Dawn Man অর্থাৎ প্রথম-যুগের লোক। বৈজ্ঞানিকদের মতে এরাই হ'লো সভ্যযুগের প্রথম মানুষ! এরাই ইংরেজদের আদিপুরুষ!

এ ছাড়া আর একটি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় চীনে পিকিং-সহরে। এই সেদিনের কথা। বোধ হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর নামকরণ হয়েছে পিকিংম্যান বলে। অনেকে মনে করেন জাভাম্যানের পরই এই জাতীয় মানুষ বেঁচে ছিল পৃথিবীতে।

একবার আফ্রিকার রোডেশিয়া অঞ্চলে খনি খুঁড়তে খুঁড়তে কতক-

গুলো জীবজন্তুর হাড়ের সঙ্গে একটা মানুষের মাথা ওঠে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন এই রোডেশিয়ানম্যানটি নাকি সাড়ে তিন লক্ষ বছর আগে বেঁচে ছিল। এই ভাবে আমরা মানুষের পূর্বপুরুষের কথা জানতে পেরেছি বৈজ্ঞানিকদের তথ্য থেকে।

মুক্তার চাষ

মণিমুক্তোর নাম শুনলেই আমরা চমকে উঠি—ও বাবা, সে যে ভয়ানক দামী জিনিষ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে কিনতে! ওসব রাজা মহারাজা প্রভৃতি বড় লোকদের ঘরেই একমাত্র শোভা পায়! মোটকথা এগুলি যে খুব মূল্যবান রত্ন সে সম্বন্ধে আর মনে কোন সন্দেহ থাকে না। আরো এ সম্বন্ধে মনে বিস্ময় জাগায় যখন আমরা শুনি এগুলি কেমন করে পাওয়া যায়। অদ্ভুত সে সব কাহিনী। শুনতে শুনতে বারবার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

কোন্ অতল সাগরের গর্ভে শুক্তির বক্ষে হয়ত এই মুক্তা লুকিয়ে থাকে। ডুবুরিরা খুঁজে খুঁজে মরে তাকে পাবার জন্য। সমুদ্রকে তোলপাড় করে ফেলে তারা। এর জন্য তারা মৃত্যুকে ভয় করে না, বিপদকে গ্রাহ্য করে না। শুধু মুক্তোর লোভে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

সমুদ্রের তলায় যে রাশি রাশি ঝিনুক আছে তারা কিন্তু যকলেই রত্নগর্ভা নয়। তাদের মধ্যে মাত্র একটি কি দু'টির গর্ভে হয়ত জন্মায় এই বহুমূল্য মুক্তো। এদের বলে শুক্তি। এরা দুর্লভ! কথিত আছে, স্বাতি নক্ষত্রের জল এদের গর্ভে পড়লে তবে নাকি এই মুক্তো জন্মায়।

কিন্তু এত কষ্ট করে এবং জীবন বিপন্ন করে যে দুষ্প্রাপ্য রত্নটি পাওয়া যায় তার মূল্য নিরূপণ করা বড় সহজ কথা নয়। তাই একটি

মুক্তো যখন কল্পনাতীত মূল্যে বিক্রী হয় তখন মনে হয় এর অধিকাংশ মূল্য প্রাপ্য তাদের, যারা একে ভয় ভীষণ সাগরেয় অন্ধরাজত্ব থেকে ছিনিয়ে এনে মানুষকে উপহার দিয়েছে, তাদের কণ্ঠের শোভাবর্দ্ধন করবার জন্য।

পাতালপুরীর রাজকন্যা এলো মানুষের ঘরে! মূল্য তার কত কে বলবে? তাই মানুষ মুক্তোর মূল্য দিতে গিয়ে নিজের কল্পনাতীত সৌভাগ্যের মুল্য দেয়। কবি মধুসূদন বলেছেন—

একটি মুক্তার লোভে ডোবেরে অতল জলে যতনে ধীবর।
শত মুক্তা ধিক্ আয়ু কালসিন্ধু জল তলে ফেলিস পামর॥

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা নেই। তাঁদের কাছে এই জিনিষটা খুব ভাল লাগল না। তাঁরা দেখলেন, যে মুক্তোর জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোক এত রাশি রাশি টাকা দিতে প্রস্তুত তা অন্য কোন উপায়ে তৈরী করা যায় কিনা

বৈজ্ঞানিকদের অসাধ্য কিছুই নেই! তাঁরা অমনি গবেষণা শুরু করলেন। এবং একদিন তাঁদের কৃতিত্ব দেখে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তাঁরা এক রকম নকল মুক্তো আবিষ্কার করলেন যা দেখতে হুবহু আসলের মত—আকারে প্রকারে বর্ণে দীপ্তিতে কোথাও কোন প্রভেদ নেই। অথচ তার দাম আসলের চেয়ে শতগুণ কম।

আজ বাজারে যে এত মুক্তোর ছড়াছড়ি দেখ তা এই বৈজ্ঞানিকদের জন্য। ধনী দরিদ্র সকলেই এখন ইচ্ছা করলে অল্প মূল্যে এই সব মুক্তো পেতে পারে। এই মুক্তোগুলিকে বলে 'কালচার্ড পার্ল।' নকল বলতে মনে করোনা যেন একেবারে ঝুঁটো, বাজে কোন রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরী। অবশ্য বাজারে এক রকমের পুঁথি পাওয়া যায় যাকে দেখতে

ঠিক মুক্তোর মত। সেগুলি যাত্রার দলের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দেহে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। আমি তাদের কথা বলছি না।

কালচার্ড মুক্তো মানে যে মুক্তোকে চাষ বা আবাদ করে পাওয়া যায়। মুক্তোর আবার চাষ কি? তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য হচ্ছো কথাটা শুনে, না?

হাঁ—চাষ হয়। কেমন করে, সেই কথাই এখন বলবো। আমাদের দেশে দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে আজকাল এমনি করে মুক্তো তৈরী করা হচ্ছে। তোমরা যদি কোন দিন সে দিকে যাও ত দেখতে পাবে।

আমেরিকায় মিঃ বোষ্ট উইক বলে একজন জহুরী ছিলেন। তিনি প্রথম এই মুক্তোর চাষ শুরু করেন।

উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের কুলে এক রকমের ঝিনুক পাওয়া যায়; তিনি তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে প্রথম গবেষণা আরম্ভ করলেন। আশ্চর্য ফল তিনি পেলেন এতে। এই ঝিনুকগুলির মধ্যে যে মুক্তো তৈরী হ'তে লাগল আসল মুক্তোর শুক্তির চেয়ে তাতে ঢের কম সময় লাগে—বোধ হয় তিরিশ ভাগের এক ভাগ। তিনি দেখলেন এই সাধারণ ঝিনুকগুলিকে যদি প্রয়োজন মত অস্ত্রোপাচার ক'রে নেওয়া যায় ত তারা দু'মাসে এক একটি মুক্তো তৈরী করতে পারে। অথচ শুক্তির গর্ভে আসল মুক্তো জন্মাতে পাঁচ থেকে ছ'বছর অন্ততঃ সময় লাগে। জাপানে যে ব্যারণ মিকি মটোর আসল মুক্তোর কারবার আছে তাঁর তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে এই সময়ের আগে কিছুতেই ভাল মুক্তো আশা করা যায় না।

অবশ্য এও ঠিক যে, দু'মাসে যে মুক্তো জন্মায় তার রঙ্‌, দীপ্তি ও স্থায়িত্ব কিছুতেই দীর্ঘদিনব্যাপী প্রস্তুত আসল মুক্তোর সমতুল্য হতে পারে না। তা না হ'লেও কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ মুক্তোগুলি

গোলাকৃতি ধারণ করে এবং ঝিনুকের মধ্যে যে অপর বস্তু পুরে দেওয়া হয় মুক্তো তৈরী হবার জন্যে তার চারিপাশে স্তরের পর স্তর গঠন ক'রে মুক্তোর মত দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। কিন্তু বেশীদিন থাকলে এই মুক্তাগুলি যেমন কঠিন, তেমনি সুগোল ও তেমনি রঙদার হয়ে ওঠে একেবারে আসল মুক্তোর মত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এই রকমের ঝিনুক পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়া নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ঝিনুক ক্যালিফোর্নিয়ার তীরে দেখা যায়। ঝিনুক-শিকারীরা পার্বত্যময় উপকুল থেকে অতি কৌশলে সেইগুলি সংগ্রহ করে আনে। সেইখানে সবচেয়ে বেশী জন্মায় লাল, কাল, সবুজ ও পাটকিলে রঙের ঝিনুক। তাদের মধ্যে আবার কোন কোন জাতের ঝিনুক তেরো ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এগুলির মধ্যে খুব বড় বড় মুক্তো জন্মাবার সুযোগ পায়। আসল মুক্তোর যে শুক্তি সেগুলি সাধারণত ছোট—স্থান সঙ্কুলান হয় না বলে তাদের মধ্যে খুব বড় ধরণের মুক্তো জন্মাতে পারে না।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে যে শ্রেণীর ঝিনুক পাওয়া যায় তারাই খুব সম্ভব পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ও দীপ্তিময়। আর সচরাচর দেখা যায় এই ঝিনুকগুলি যেমন দেখতে তার মধ্যে মুক্তোও জন্মায় ঠিক সেই রকম। তাই মিঃ বোষ্টলইক আশা করছেন একদিন এই সব মুক্তোর মধ্যে নানা রকমের রঙের আভা দেখা যাবে।

যে ঝিনুকের মধ্যে এই সব মুক্তো জন্মায় সেই ঝিনুকের নিজস্ব দোষ গুণের ওপরই মুক্তো ভালমন্দ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ছোট বড় একেবারে গোটা কিংবা জোড়া—সমস্তই ঝিনুকের উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভর করে।

বড় ও গোটা মুক্তো পেতে হলে ঝিনুকের দেহটা অল্প একটু চিরে দিতে হয়, তারপর খুব অল্প ঝিনুকের শাঁস গোল করে নিয়ে সেই অস্ত্র

করা স্থানটির ওপর বসিয়ে দিতে হয়। তখন সেই ঝিনুকটি সর্বাঙ্গে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে অর্থাৎ এই অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডটুকুর চারিধার জ্বলতে থাকে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেলে দেবার খুব চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই পারে না। শেষে নিরুপায় হয়ে যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিজের দেহ থেকে আঠার মত এক রকম তরল পদার্থ বার ক'রে সেই ছোট্ট বস্তুটির ওপর প্রলেপ দিতে থাকে। এই রকম যত প্রলেপ দেয় তত স্তর গড়ে ওঠে। এইভাবে একদিন মুক্তো তৈরী হয়। এই তরল পদার্থটি আর কিছুই নয়, ঝিনুকের দেহের রস। কাজেই ঝিনুকের দেহের যে বর্ণ, যে আভা মুক্তোও ঠিক সেই বর্ণ ও সেই আভা প্রাপ্ত হয়।

অবশ্য ঝিনুককে অস্ত্রোপচার করে তার মধ্যে এই শাঁসটুকু ভরে দেবার পর সেই ক্ষত স্থানটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। তারপর সেই চিকিৎসিত ঝিনুকটিকে নিয়ে ল্যাবরটরীর মধ্যে একটি চতুষ্কোণ চৌবাচ্চায় রেখে তাতে সমুদ্রের জল ভর্তি করে দেওয়া হয়।

বোষ্টউইক্ বলেন, প্রথম দু'সপ্তাহ আর ঝিনুকদের বিশেষ কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না, কেননা সেই ঘা শুকতে ও যন্ত্রণা উপশম হতেই লেগে যায়।

সেই সময়টা শুধু জলটাকে তিনি ঠাণ্ডা করে রাখেন এবং উপযুক্ত হাওয়া বাতাস যাতে পায় তার ব্যবস্থা করেন। তারপর এই সময়টা কেটে গেলে ঝিনুকগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এবং চৌবাচ্চার চারিধারে ঘুরে ঘুরে ঘাস ও নানারকমের আগাছা খেয়ে বেড়ায়। এই সময় তাদের ক্ষিদেটা খুব বেশী হয়। তারা খুব খায়। আর তাদের এই খাদ্যটা যাতে বিশেষ স্বাস্থ্যকর হয় সেইদিতে নজর রাখতে হয়।

বোষ্টউইক্ বলেন, এরচেয়ে তাড়াতাড়ি তাদের সুস্থ করে তোলবার আর কোন ব্যবস্থাই নেই। তবে গোড়া থেকেই জলের মধ্যে অল্প অল্প খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়, যদি কোন ঝিনুকটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে তার যেন কোন খাদ্যের অভাব না ঘটে। এই দু'সপ্তাহের মধ্যে সাধারণত কয়েকটি ঝিনুক মরে যায়। কেননা অনেকে এই অস্ত্রোপচার সহ্য করতে পারে না। তবে এর পরেও যারা বেঁচে থাকে তারা আর মরে না, মুক্তো তৈরী করে—অবশ্য যদি ঠিক স্থানে সেই শাঁসটুকু রাখা হয়। তোমরা বোধহয় বুঝতে পারছো যে এই জিনিষটির ওপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

এইভাবে জোড়ামুক্তোও তৈরী হয়।

আবার কখনো কখনো এর ভেতরে এমন বৃহদাকার মুক্তো জন্মায় যে অত্যধিক চাপে মুক্তো ভেঙ্গে যায় এবং ওপরের আচ্ছাদন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এই কারণে বড় সাইজের মুক্তো খুব কম দেখা যায় এবং দুষ্প্রাপ্য বলেই তাদের মূল্য এত বেশী।

মিঃ বোষ্টউইক্ প্রায় ছ'শো রকমের ঝিনুক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তবে বড় মুক্তো তৈরী করার রহস্য জানতে পেরেছেন। এই সময়ে তিনি মুক্তোতে কি করে রঙ্ রাখতে হয় তাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করে-ছিলেন। তিনি হাতীর কান থেকে কতকগুলি কালো মুক্তোও সৃষ্টি করেছিলেন।

এছাড়া তিনি বড় পাটকিলে রঙের শাঁখ থেকে বড় বড় মুক্তো তৈরী করতে পেরেছিলেন। অবশ্য মুক্তো তৈরী করবার নিয়ম সর্বত্রই এক, তবে এসব ক্ষেত্রে শাঁখের দেহ থেকে একটু বেশী পরিমাণে রস বেরোয় বলে তার দ্বারা একটু বড় আকৃতির মুক্তো তৈরী হয়। শাঁখের গর্ভে যে মুক্তোর সৃষ্টি হয় তার রঙ সাধারণত অনেক রকম হয় এবং তাদের অধিকাংশই দেখতে ডিম্বাকৃতি কিংবা একটু লম্বাভাবের। ডিম্বাকৃতি

ডিম্বাকৃতি অথবা সম্পূর্ণ গোলাকৃতি মুক্তো খুবই কম জন্মায়। এবং যদি এরমধ্যে কোন একটি স'ত্যিকারের ভালো রঙ ও আকৃতিবিশিষ্ট হয় ত রাজা মহারাজারা খুব চড়া দাম দিয়ে তাকে কেনেন। এরকম মুক্তো তাঁরা ভারী পছন্দ করেন।

শাঁখ থেকে যেসব পাটকিলে রঙের মুক্তো জন্মায় সেগুলি ফ্রান্সের লোকেরা খুব পছন্দ করে। তারা এই শ্রেণীর মুক্তোকে বলে 'রোজ পার্লস্'।

মিঃ বোষ্টউইক্ শাঁখ নিয়ে মুক্তোর গবেষণা করতে করতে একবার এই রকম একটা মুক্তো পেয়েছিলেন! ৪২ গ্রেণ তার ওজন এবং এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা তার মূল্য ধার্য হয়েছিল!

প্রথমে তিনি এই শাঁখ থেকেই মুক্তো তৈরী স্নরু করেছিলেন। তারপর এতে সাফল্যলাভ করবার পর তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের কুলে গিয়ে ঝিনুক নিয়ে পরীক্ষা করেন। অবশ্য এই ঝিনুকের মুক্তোগুলি সকলেই পছন্দ করে বেশী, কারণ তাদের দুগ্ধশুভ্র রঙের প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হন। আজকাল অনেক জায়গায় এই মুক্তোর চাষ হচ্ছে, তবে সকলেই এই ঝিনুক থেকে তৈরী করে! কেননা ওইটেই বেশী বাজার চলতি এবং ব্যবসায়ের দিক থেকেও লাভজনক।

বিমান অভিযান

এরোপ্লেন্ যখন আকাশে ওড়ে তোমরা তার শব্দ শুনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ো দেখবার জন্য, কিন্তু আকাশের চারদিকে চেয়ে চেয়ে তাকে খুঁজে পাও না। কোথায় গেল? তখন এদিকে দেখ—ওদিকে দেখ। এমন সময় হঠাৎ দেখা যায় ওই—ওই যে মেঘের মধ্যে থেকে বেরুচ্ছে। আবার তৎক্ষণাৎ হয়ত লুকিয়ে পড়ে মেঘের ভিতরে। মোট-

কথা মেঘেরও উঁচু দিয়ে যে এরোপ্লেন্ যেতে পারে একথা তোমরা জানো।

কিন্তু কত উঁচু দিয়ে যেতে পারে একবার ভেবে দেখেছ কি ? আজ এরোপ্লেন্ ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশো মাইল গতি অর্জন করেছে বটে কিন্তু তার এই গতি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ—যেখানে খুশী আকাশের ওপরে উঠতে পারে না। অনেক উঁচুতে, মেঘের ওপরে যেখানে আমাদের দৃষ্টি হয়ত পৌঁছয় না সেখানেও যেতে পারে কিন্তু তার চেয়েও বেশী দূর আর পারে না।

কারণ শূন্যে আকাশের বহু উর্দ্ধে এমন সব বায়ুমণ্ডল আছে যেখানে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, এরোপ্লেনের কলকব্জা বিকল হয়ে যায়। মরুপ্রদেশের চেয়ে এত বেশী ঠাণ্ডা সেখানে যে, মানুষ জমে যায়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, অন্ধ হয়, বমি করে, চৈতন্য হারায়।

অদ্ভুত এইসব বায়ুমণ্ডল! এখানে যেতে গিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রাণ হারিয়েছেন। তাই আজো হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট অজেয় হয়ে আছে। অথচ এর উচ্চতা মাত্র ২৯০০২ ফুট! চির তুষারমণ্ডিত এই গিরিশৃঙ্গ রহস্যময়! এপথে চলা সবচেয়ে বিপদজনক তা জেনেও কিন্তু বার বার বৈজ্ঞানিকরা জীবন বিপন্ন করেন। আজো তাঁরা চুপ করে বসে নেই। গবেষণার পর গবেষণা করছেন। যেমন করে হোক এই তুষারপ্রাচীর ভেদ করতেই হবে!

অথচ শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত পথে যাঁরা ২৯০০২ ফুট উঠতে পারেন নি, তাঁরাই কি অসাধ্যসাধন করেছেন! পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দশ মাইল উচ্চে তাঁরা আরোহণ ক'রে জগতে বৈমানিক কৃতিত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছেন। যে বৈমানিক এই সম্মান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর নাম এম, জে, এডাম্। এঁকে বিমান সম্রাট বলা হতো। শূন্যে আকাশের সর্বোচ্চস্থানে উঠে ইনি

প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন এঁরা জীবদ্দশায় পৃথিবীর আর কোন বৈমানিক এঁকে পরাজিত করতে পারেন নি।

এইত সেদিনের কথা। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন হ্যামশায়ারের এক জায়গা থেকে তিনি তাঁর এরোপ্লেন নিয়ে এই দুঃসাহসিক কার্যে যাত্রা করলেন!

অবশ্য এর জন্য সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য এই সব বৈমানিকের নয়। কেননা, পথে যাতে তাঁদের কোন বিপদ না হয় তারজন্য বৈজ্ঞানিকদের বহু পরিশ্রম করতে হয়—তাঁরা এমন সব যন্ত্রপাতি গ্যাস ও বেশভূষা বৈমানিকদের সঙ্গে দেন যাতে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই তাঁদের আর কোন ক্ষতি করতে না পারে। বৈজ্ঞানিকদের এই সব আবিষ্কারের কথা পরে বলছি।

বহুদিন পূর্বে একজন বৈজ্ঞানিক সাত মাইল পর্যন্ত উঠেছিলেন। তাঁর নাম জেমস্ গ্লেইসার্। তিনি ও তাঁর বন্ধু কক্স্‌ওয়েল একটা বেলুনে করে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু উড়তে উড়তে সাত মাইল উঁচুতে পৌঁছতেই তাঁদের মনে হলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে, চোখের সামনে তাঁরা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সব ঝাপ্‌সা। অথচ তখন ঠাণ্ডায় সারা দেহ এমন অসাড় হয়ে গেছে যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর কোনদিকেই নড়াতে পারছেন না। তার ওপর তাঁদের মনে হতে লাগল ক্রমশই যেন তাঁদের সমস্ত চৈতন্য লোপ পাচ্ছে। সর্বনাশ! কি হবে ভাববার অবসর পর্যন্ত নেই। কক্স্‌ওয়েল একবার আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস ভ্যাল্‌বের দড়িটা ধরতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আঙ্গুল নড়াতেই পারলেন না। তখন দাঁত দিয়ে সেই দড়িটা কামড়ে ধরলেন। আর যেই ধরা অমনি তিনি অচৈতন্য হয়ে সেখানে পড়ে গেলেন।

ভগবান যেন মুখ তুলে চাইলেন। এই পতনের ফলে দড়িতে টান লাগতেই সেই গ্যাস ভাল্‌বটি খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুহু ক'রে গ্যাস

ছাড়তে ছাড়তে বেলুনটি নীচে নামতে লাগল।

এইভাবে খানিকটা নীচে নামবার পরই আবার ধীরে ধীরে তাঁদের জ্ঞান ফিরে এলো। আবার তাঁরা চোখে দেখতে পেলেন এবং শরীরের সর্বাঙ্গে শক্তি অনুভব করতে লাগলেন।

এ সমস্ত বিপদের কথাই বৈমানিকরা জানতেন তবুও আকাশের সর্বোচ্চ অংশে উঠে গৌরবলাভ করবার লোভ কেউ সংবরণ করতে পারতেন না। কোন্ দেশ, কোন্ জাত আগে উঠবে তার জন্য রীতিমত প্রতিযোগীতা শুরু হ'তো।

১৯০৯ সালে হুবার্টলেথাম্ নামে একজন বৈমানিক ৫০৯ ফুট উচ্চে উঠে প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। তারপরে আরো তিরিশ বার প্রতিযোগীতা হয়েছিল এবং প্রত্যেকবারই ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মেনা এই সম্মান ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। ১৯২৯ সালে ফ্রান্স ৪৩০০০ ফুট উঁচুতে উঠে এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিল।

অবশেষে ১৯৩২ সালে ইটালীর এক বৈমানিক ৪৪,০০০ ফুট উঠে ফ্রান্সকে পরাজিত করলেন। ব্রিটেন এই প্রতিযোগীতায় ইটালী ও ফ্রান্সের কাছে দু'বার পরাজিত হয়েছিল। তাই আবার ১৯৩৬ সালে ৫০,০০০ ফুট উঠে সে এই সম্মান লাভ করলে। কিন্তু এর আট মাস পরেই আবার ইটালীর কর্ণেল মেরীও পেজী ৫১,০০০ ফুট উঠে সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করলেন।

ব্রিটেন এ পরাজয় কিছুতেই সহ্য করতে পারলে না। এত সময় নষ্ট করে, এত অর্থ ব্যয় করে, যে সম্মান সে অর্জন করেছিল সেটা হারাতে দেশবাসী অত্যন্ত মর্মাহত হ'লো।

তাই এক মাসের মধ্যে আবার ব্রিটেন এই প্রতিযোগীতায় নামল এবং এবার লেফট্ন্যান্ট্ এডাম্ দশ মাইল উঁচুতে উঠে ফের এই গৌরব লাভ করলেন।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শুধু পাখীরা যে আকাশে রাজত্ব করে এসেছে মানুষ তারও উর্দ্ধে উঠে সমস্ত জগতকে বিস্মিত করে দিলে।

অথচ শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে ব্রিটেন মাত্র পাঁচ বৎসরের চেষ্টার ফলে এই সম্মান লাভ করেছিল। কেমন করে এইবার বলছি।

১৯০৮ সালে এই এডাম্ জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটেনে সেন্ট্ এণ্ড্স নামক এক স্থানে। তারপর মাদ্রাজ, সেন্ট্ এণ্ড্স ও এডিনবরা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বহু স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখে আবার এডিনবরায় টিউটোরিয়াল কলেজ ও এপিস্কোপাল কলেজে গিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করতে লাগলেন।

এমন সময় যেন তাঁর কানে আকাশের ডাক এসে পৌছল। তিনি কলেজ ছেড়ে এসে রয়েল এয়ার ফোর্সে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর।

সেখানে গিয়ে তিনি ছোট ছোট দূরত্বের জন্য যেসব বিমান যাতায়াত করতো সেই বিভাগে একজন অফিসারের পদে নিযুক্ত হলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিমান সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এমন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব ক'রে ফেললেন যে শীঘ্রই উচ্চ-কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

তাঁরা তখন এডামকে আরো সুযোগ দিতে লাগলেন যাতে বিমান সম্বন্ধে আরো বহু অভিজ্ঞতা তিনি দ্রুত লাভ করতে পারেন এবং তাঁর দ্বারা জগতের সভায় নিজের দেশের মুখ উজ্জল হয়। কেননা তাঁরা একথা বিশ্বাস করতেন যে কোন বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হ'লে সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করা দরকার!

আগেকার কালে এসব অবশ্য ছিল না তাই সে সময় প্রায়ই নানা রকমের দুর্ঘটনা ঘটতো এবং অকালে বহুলোক প্রাণ হারাতে বাধ্য হ'তো।

পূর্বে শুধু সাহস থাকাকেই লোকে বৈমানিকের যথেষ্ট গুণ বলে মনে করতো কিন্তু এখন আর তাতে চলে না। এখন এই কাজে নিরপত্তাই হ'লো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গুণ। তাই বৈমানিক এখন এমন্ লোকেরা হয় যাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান আছে। আর শুধু পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই চলে না। নিজে হাতে করে সমস্ত খুঁটি-নাটি কাজ করতে হয়। তাছাড়া শূন্যে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে বুঝতে হয়, ধাতুনির্মিত যন্ত্রসকলও পরিষ্কার করতে হয় নিজে হাতে। এক কথায় এখন বৈমানিককে বলা যেতে পারে চালক, রাসায়নিক, পদার্থবিদ। এছাড়াও সাহসী, স্বাস্থ্যবান ও খুব ঠাণ্ডামস্তিষ্ক হওয়া দরকার।

এডামের এসব গুণ ছিল। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠালেন যখন তাঁর মাত্র বাইশ বৎসর বয়স। তিনি সেখানে গিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং বোমারু বিমান বাহিনীতে পর পর তিন বছর কাজ করলেন। তারপর ১৯৩৬ সালে তিনি বিলাতে গিয়ে আবার বিমান গবেষণা বিভাগে ভর্তি হলেন। এইখানে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠলো। কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে সেখান থেকে এই প্রতিযোগীতায় পাঠালেন।

এডাম্ বিজয়ী হয়ে ফিরে এলেন। সমস্ত পৃথিবী চমকিত হলো তাঁর কৃতিত্ব দর্শনে। শূন্যে সোজা দশ মাইল উঠে গিয়ে তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেকর্ড ভঙ্গ করলেন!

যে বিমানটি নিয়ে তিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন সেটির নাম 'ব্রিষ্টল ১৩৮'—৪৯০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। তাছাড়া এমনভাবে এর ইঞ্জিনটি তৈরী যাতে বহু উর্দ্ধে যেখানে বায়ুস্তর অতি তরল সেখানেও পূর্ণশক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়।

এর যে ডানা দু'টি তার দৈর্ঘ হলো ৬৬ ফুট—এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত মাপ মোট ৪৪ ফুট। বাতাস কাটাবার জন্যে সামনে যে

পাখাগুলি আছে তার এক একটি পৌনে তের ফুট।

এই বিমানটিতে ইঞ্জিনের কলকব্জা ও ওঠানামার চাকাগুলো ছাড়া আর সমস্তই কাঠ দিয়ে তৈরী। বৈজ্ঞানিকরা বলেন কাঠ ছাড়া আর কোন ধাতু দিয়েই নাকি এত হাল্কাভাবে এই বিমান তৈরী করা সম্ভব হতো না।

দু'টন পর্যন্ত ওজনের মাল বহন করবার শক্তি আছে এই বিমানটির। তবে সব সময় যে ভার নিয়ে তাকে উড়তে হয় তার ওজন হচ্ছে মোট ৮৪৩ পাউণ্ড—চালক, সাড়ে চার হন্দর তেল ও ওই জাতীয় ইন্ধন এবং কুড়ি পাউণ্ড ওজনের প্যারাচুট্ সমেত।

কলকব্জা সবই ছিল এই বিমানটিকে সত্যি কিন্তু তার সঙ্গে আরো বহু সমস্যাও ছিল। এমন উঁচুতে তাকে উঠতে হবে এবং উঠে বেঁচে থাকতে হবে যেখানে কোন মানুষ কোনদিন যেতে পারে একথা প্রকৃতি দেবী পর্যন্ত ভাবতে পারেননি!

মাটির ওপর এই বিরাট বায়ুমণ্ডলের নীচে আমরা বাস করি! এখানে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি তার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনেরো পাউণ্ড। আর তার মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগ থাকে অক্সিজেন অবশ্য যদি এই বায়ু বিশুদ্ধ হয়। কাজেই যত উঁচুতে ওঠা যায় তত এই বাতাসের চাপ কমে আসে ফলে অক্সিজেনও কম প্রবেশ করে দেহের মধ্যে। সেইজন্য খুব উঁচুতে উঠে অভিযানকারীদের জীবন রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, কেননা প্রায়ই তাঁদের দম বন্ধ হয়ে যায়।

খুব বেশী উঁচুতে না উঠলে অর্থাৎ মাঝামাঝি উচ্চতা পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহ ক'রে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে ঠিক রাখা যেতে পারে। কিন্তু ৪০,০০০ ফুটের ওপরে গেলে এই কৃত্রিম অক্সিজেনও ফুসফুসের ওপর ঠিকমত ক্রিয়া করতে পারে না। কারণ

মাটির ওপরে—সমুদ্রের লেভেলে স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসের যে চাপ থাকে ওপরে উঠলে তার অভাববশতঃ ফুসফুস্‌টা অসাধারণভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে, সেইজন্য কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন দিয়ে বাইরের সেই চাপকে রক্ষা করতে হয় দেহে।

বৈজ্ঞানিকরা তাই বহু গবেষণা করে এক রকমের পোষাক তৈরী করেছেন যেগুলি দেখতে অনেকটা ডুবুরীদের পোষাকের মত এবং কাজও করে তারি মত। এই পোষাকের মধ্যে কোথাও বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকতে পারে না অথচ ভিতরে ইচ্ছামত বায়ুর চাপ রাখা যায়। এরি একটা বিশেষ অংশ হ'লো মাথার টুপি—তাতে যে জানলা বসান আছে তার মধ্যে দিয়ে ইচ্ছামত অক্সিজেন নেওয়া যায়। এডাম এই থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন আবার যেটা ছাড়তেন অর্থাৎ সেই পরিত্যক্ত বায়ুটা আর একটা এমন যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে পড়তো যেখানে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তার কার্বন-ড্রাই-অক্সাইড ও আর্দ্রবায়ুকণা মিলিত হ'য়ে আবার নতুন অক্সিজেনে পরিণত হতো। এইভাবে সর্বদা নতুন অক্সিজেন আপনাআপনি সরবরাহ হতো সেই বিমানটিতে।

এখন তোমরা এই যন্ত্রটি ও তার উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝলে। কিন্তু একটা জিনিষ এখানে মনে রেখো যে এই যন্ত্রটি যে সে ব্যবহার করতে পারে না। এর জন্যেও রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন। ঠিক ডুবুরীদের সমুদ্রের অতল গর্ভে নামবার সময় যেমন পরিশ্রম করতে হয় এবং যেভাবে হুঁসিয়ার থাকতে হয় এখানেও তার চেয়ে কোন অংশেই কম হয় না বরং বেশী। কাজেই বুঝতে পারছো বোধহয় যে মিঃ এডামকে এর জন্য কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

কখন কতটা অক্সিজেন প্রয়োজন, ওড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এর হিসাব সঠিক এবং অতি দ্রুত হওয়া দরকার

তা না হলেই সমূহ বিপদ!

এইভাবে প্রথমে সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে তবে এডাম তাঁর বিমানপোতখানি নিয়ে আকাশে উড়েছিলেন এবং ইটালীর বৈমানিক মেরিও পেজীকে পরাজিত করে ৫১,৩৬২ ফুট উঁচুতে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু এতেও তাঁর জয়লাভ সম্পূর্ণ হলো না। আন্তর্জাতিক বিমান সঙ্ঘ বললেন অন্ততঃ পূর্ববর্তী বৈমানিক অপেক্ষা এক হাজার ফুট বেশী উর্দ্ধে না উঠতে পারলে এই প্রতিযোগীতায় এ কে জয়ী সাব্যস্ত করা হবে না।

অগত্যা এডামকে আবার ৫২,৩৪৬ ফুট উঠতে হ'লো। দূরত্ব-জ্ঞাপক একটি যন্ত্র তখন সেই বিমানপোতটির মধ্যে এমন জায়গায় রাখা হলো যেখানে তাঁর হাত না যায়। এ যন্ত্রটি অনেকটা ট্যাক্সির মিটারের মত। যত উঁচুতে বিমানটি ওঠে সঙ্গে সঙ্গে তার হিসাবও তাতে লেখা হয়ে যায়।

এডাম এবার বীরের মত তাঁর বিমানপোতটি নিয়ে মেঘের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মহাশূন্যে যেখানে প্রকৃতির নব নব রহস্য মানুষের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে তোলে সেখানেও তিনি দৃঢ়ভাবে কঠিন হস্তে বিমানের হাতলটি ধরে বসে রইলেন। গোঁ গোঁ রবে সিংহ গর্জন করতে করতে ছুটলো সেই যন্ত্র দানব বায়ুর স্তর ছিন্ন ভিন্ন করে উর্দ্ধ পথের উদ্দেশ্যে। যত উঁচুতে ওঠে তত যেন তার আশা মেটে না, মনে হয় আরো—আরো—

এইভাবে মাত্র ষাট মিনিটে এডাম পঞ্চাশ হাজার ফুট পথ অতিক্রম করলেন। তারপর সেখান থেকে আরো উর্দ্ধে উঠতে লাগলেন। কিন্তু ৫৩,৯৩৭ ফুট উর্দ্ধে এসেই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন তাঁর ইঞ্জিনটির আর নতুন শক্তি অর্জন করবার ক্ষমতা নেই। কাজেই

তৎক্ষণাৎ তিনি নামতে শুরু করলেন এবং নিরাপদে ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে।

হাজার ফুট ত দূরের কথা, এবার তিনি ইটালীয় বৈমানিক মেরিও পেজীকে পরাজিত করলেন ৩,৫৭৫ ফুটে।

এই দীর্ঘ পথ উঠে আবার নেমে আসতে তাঁর মোট সময় লেগেছিল ছু'ঘন্টা পনেরো মিনিট। এই প্রতিযোগীতায়—এত অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মেনী, আমেরিকা ও ইটালীর আর কোন বৈমানিক ফিরে আসতে পারেননি।

এডাম ছিলেন সত্যিকারের বড় বৈজ্ঞানিক। তাই পথের সমস্ত বিপদ তিনি অতি সহজেই অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বিমানের মধ্যে অক্সিজেনের এমন ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন যাতে করে ৮০,০০০ ফুট উচুতে পর্যন্ত অনায়াসে ওঠা যায়। তবে ইঞ্জিনকে কার্যক্ষম রাখবার জন্য যে শ্রেণীর বাতাসের প্রয়োজন তা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই তাঁকে তখন সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তা না হলে ৬০,০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দে উঠতে পারতেন।

তাই সেবারে অতদূর উঠতে পারেননি বলে এডাম আবার তোড়জোড় করছিলেন ওপরে ওঠবার জন্যে কিন্তু তাঁর এই আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই অকস্মাৎ এক বিমান ছুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর ১৯৩৮ সালের ২২শে অক্টোবর লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ কর্ণেল মেরিও পেজী আবার ৫৬,৩১৭ ফুট উঠে বিমান জগতে সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করলেন।

এছাড়া এই কয়দিনের মধ্যে এর চেয়েও আরো বেশী উঁচুতে অপর কোন বৈমানিক উঠতে পেরেছেন কিনা সে খবর এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি!

লৌহ ফুসফুস

বৈজ্ঞানিকদের অনেক অসম্ভব অসম্ভব আবিষ্কারের কথা আগে বলেছি কিন্তু এবার আর একটা এমন জিনিষের কথা বলবো যা শুনে তোমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না।

মানুষ মরে গেলে আর বাঁচে না, একথা পৃথিবীর সব লোক জানে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা বললেন, আমরা বাঁচাবো সেই মরা মানুষকে। বৈজ্ঞানিকদের এই স্পর্দ্ধা দেখে সবাই হেসে উঠলো। বললে উন্মাদ! ভগবান যাকে মারে সাধ্য কি মানুষের তাকে বাঁচানো!

বৈজ্ঞানিকরা তখন বললেন, কোন মানুষ যে আর মরবে না, একথা আমরা বলছি না তবে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে যাদের মৃত্যু হয় তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁচানো যেতে পারে!

একথা শুনেও সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল! একটা মৃতলোক আবার বেঁচে উঠবে, এও কি কম ক্ষমতার কথা!

হ্যাঁ। তাঁরা দু'চারজনকে ইতিমধ্যে বাঁচিয়েছেন ; এবং কেমন করে তাই বলছি।

তোমরা জানো মানুষের দেহে ফুসফুস্ বা বায়ুকোষ বলে যে জিনিষটি আছে সেইটাই আসল। তার স্পন্দন কোন রকমে থেমে গেলেই মানুষ মরে যায়। এই ফুসফুসের ক্রিয়া থেকেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে। বুকে হাত রাখলে যে ধকধক করে শব্দ হয় তা এই ফুসফুসের মধ্যে হাওয়া ভরা ও শূন্য করার দরুণ উত্থানপতন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ফুসফুস জিনিষটা অনেকটা কামারের দোকানের হাওয়া করার যন্ত্র হাপরের মত।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফিলিপ ড্রিংকার অনেক ভেবে-

চিন্তে এই হাপরের মত একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এর সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া যায়। জলে ডুবে গেলে যখন ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন এই যন্ত্র আবার ফুসফুসকে সক্রিয় করে তোলে। বহু জলেডোবা লোক এই যন্ত্রটির সাহায্যে পুর্নজীবন লাভ করেছে। বিলেত আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বড় বড় হাসপাতাল মাত্রেই এই যন্ত্র আছে।

চীনে পিপিং সহরের এক হাসপাতালে এই রকম একটা যন্ত্র ছিল। আমেরিকার কোন ধনীর সন্তান একবার স্কুল কলেজের লেখাপড়া শেষ করে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এইভাবে বহু স্থান পরিদর্শন করে শেষে তিনি চীন যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে একদিন তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক—যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি ভাল খেলোয়াড়—ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন শ্বাস-কষ্টে। চব্বিশঘণ্টার ভেতরে তিনি একেবারে মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌছলেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তখন আর গ্রহণ করতেই পারছেন না।

আজকাল এই রোগটা খুব দেখা দিয়েছে। বড় বড় চিন্তাবীদ্‌ কিংবা কর্মীলোক, যাঁরা নানা কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন তাঁদের সাধারণত এই রোগ হতে দেখা যায়। এই রোগের নাম যতবড় গালভরা হোক না কেন মোট কথা এ হলো এক রকমের পক্ষাঘাত। ডাক্তাররা বলেন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা থেকেই এর উৎপত্তি।

সর্বদা মানুষ ছুটেছে পয়সার জন্য, যশের জন্য, স্বার্থের জন্য। তাদের জীবনে শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই—যেন রেশের ঘোড়া অনবরত দৌড়চ্ছে। এই অতি দ্রুততাই হলো এই রোগের মূল কারণ। বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ, মানুষের এই কল্পনাতীত লোভ! মোট কথা এই রোগে ধরলে মৃত্যু অনিবার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একদিন কি দু'দিনেই সব শেষ হয়ে যায়।

এই যুবকটির বেলায় ও হয়ত তাই হতো কিন্তু ভগবান মুখ তুলে চাইলেন! তাই সেই অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বেই একজন ডাক্তার তাঁকে এই যন্ত্রটির মধ্যে ঠিক ভাবে পুরে ফেললেন। আশ্চর্য! যদিও এই যন্ত্রটি শুধু জলেডোবা রুগীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল তবু তার মধ্যে গিয়ে সেই যুবকটি আবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগলেন এবং সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কেমন করে এটা সম্ভব হল তাই বলি। আমরা জানি যে একজন বলিষ্ঠ যুবককে সুস্থ ও সবল হয়ে বাঁচতে গেলে প্রত্যেকবার নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় এক 'পিন্ট্' করে বিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসের মধ্যে টেনে নিতে হয়। আর এইরকম দরকার হয় প্রতি মিনিটে আঠারো বার। অন্তত সাধারণভাবে বিশ্রাম করবার সময় মানুষের পক্ষে এই পরিমাণ হাওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে যদি আমরা খুব বেশী পরিশ্রমের কাজ করি অর্থাৎ এমন কাজ যার দ্বারা ফুসফুসের প্রতি মুহূর্তে আরো বেশী স্ফীত হওয়া দরকার তখন প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে একেবারে আমরা তিন পিন্ট্ পর্যন্ত বায়ু গ্রহণ করি। আবার সেই পরিমাণে ছেড়েও দিই। মোট কথা আমরা যখন বেশী পরিশ্রমের কাজ করি তখনই আমাদের বেশী অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাই আমরা ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিই। আর সেইজন্য তখন ঘন ঘন আমাদের নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে তা বোধহয় তোমরা লক্ষ্য করেছ। কাজে কাজেই সেই লৌহনির্মিত যন্ত্রটির তখন কাজ হলো সেই যুবকটির অচল ফুসফুসটিকে আবার সক্রিয় করে তোলা। ডাক্তাররা এই যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন লৌহনিমিত ফুসফুস। এটি ধাতু নিমিত একটা ঘর—দেখতে অনেকটা লম্বা পাইপের মত— এর চারিদিক এমনভাবে আঁটা যাতে এক ফোঁটা হাওয়া কোনখান দিয়ে এর ভিতরে ঢুকতে না পারে; আর সেই বায়ুমুক্ত ঘরটির সঙ্গে একটি পাম্প ও একটি ভালব্ লাগানো আছে। তাছাড়া এই পাম্পটির সঙ্গে

আবার একটি ইলেকট্রিক মোটর সংযুক্ত। এখন যে মানুষটির চিকিৎসা করতে হবে তার দেহটা সমস্ত এর মধ্যে ভরে দিয়ে শুধু মুখটিকে বাইরের হাওয়ায় উন্মুক্ত রাখতে হয়। তারপর মিনিটে আঠারোবার এই পাম্পটিকে খুলে দেওয়া হয়—মানে এই যন্ত্রটি তখন সেই আবদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে প্রয়োজন মত হাওয়া টেনে বার করে আনে।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। তোমাদের বোধহয় মনে আছে আমি আগে বলেছি যে সমুদ্র-সমতলে মানুষের দেহ আপনি বাইরের হাওয়ার চাপের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলে। এখানে আমাদের দেহের ভিতরে ও বাহিরে বাতাস যে চাপ দেয় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তার ওজন পনেরো পাউণ্ড।

সেইজন্যে যেই সেই পাম্পটি বাইরের হাওয়ার চাপ কমিয়ে দেয় অমনি ফুসফুস ফুলে ওঠে ভেতরের চাপে। এইভাবে যুবকটির ফুসফুস যখন আপনাআপনি স্ফীত হয়ে ওঠে তখন সেই লৌহ ফুসফুসটির ওপরের একটি ভালব্ খুলে দেওয়া হয় আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হাওয়া ঢুকে আবার সেই স্ফীত ফুসফুসকে সমান করে দেয়। এইভাবে দূষিত হাওয়া বা ফুসফুসের মধ্যে থেকে যেটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সেটা আবার পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রের মধ্যে থেকে নিষ্কাষিত করা হয়। আবার বিশুদ্ধ হাওয়া ভাল্বের মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানো হয় আবার বের করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রুগীর ফুসফুস কার্যকরী হয়ে ওঠে। আর এই নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় যে অক্সিজেন হাওয়ার সঙ্গে সেই যন্ত্রের মধ্যে ঢোকে তা এত বিশুদ্ধ যে তার সাহায্যে আবার রক্তে অতি দ্রুত জীবনীশক্তি ফিরে আসে। ফলে রুগী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করে।

এইভাবে সেই আমেরিকার ধনী যুবকটি সেদিন পুনর্জীবন লাভ করলেন সেই লৌহ ফুসফুসের সাহায্যে। জয় হোক এই যন্ত্রের! আর

জয় হোক এর আবিষ্কারকের।

এই নিয়ম অনুসরণ করে আজকাল আর এক রকমের নূতন যন্ত্র বেরিয়েছে, তারি সাহায্যে যে কোনরকম আকস্মিক মৃত্যু থেকে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে বাঁচাচ্ছেন। সম্প্রতি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই রকমের একটি যন্ত্র এসেছে। এটি এক বিদেশী মহাপুরুষ দান করেছেন ভারতবাসীর কল্যাণে।